Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা গদ্যের ধারায় সৈয়দ মুজতবা আলী

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নূরুর রহমান খান
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.7
Pages	95-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা গদ্যের ধারায় সৈয়দ মুজতবা আলী

নূরুর রহমান খান

০১.

ক. 'বেশির ভাগ লেখক আপন দেশকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাঁরা কুশলী শিল্পী হ'লেও তাঁদের রচনায়···বিশ্বমানবিক সুরটি লাগে না; আর কোনো-কোনো লেখক আপন দেশকালের পরিবেশের শরীরে বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেন, তাঁরাই বড়ো লেখক, তাঁরাই মহৎ শিল্পী।'[১]

খ. '১৯৪৮-এর ১৩ই মার্চ থেকে ['দেশ'-এ] এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের লেখা শুরু হল। এই লেখা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করল। বাঙালী পাঠক এ ধরনের লেখা আগে পড়েননি। লেখার নাম 'দেশে-বিদেশে', লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। এমন আশ্চর্য ও অসাধারণ রচনা পৃথিবীর যে কোনো ভাষায়ই বিরল।[২]'

গ. 'সবাই মুজতবা নন, কিন্তু সকলেরই মুজতবা হবার ইচ্ছে। ইচ্ছেটা যে রসরুচি থেকে জন্মায় তা নয়, তার মূল উৎস অন্যত্র। যেহেতু জীবন বিষয়ে গভীর করে ভাববার স্থৈর্য নেই, কিংবা এমন কি ক্ষমতাই নেই ভাবনার, অথচ রচনাবিলাস পুরোপুরি বর্তমান—অতএব মুজতবা পন্থী হতে মনোযোগ।'[৩]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ের মূল বক্তব্য:

১. মহৎ লেখক দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন এবং তাঁর সৃষ্টি আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ;

২. 'দেশে বিদেশে' অসাধারণ সৃষ্টি, এবং

৩. সৈয়দ মুজতবা আলী খ্যাতিমান সাহিত্যিক।

সুতরাং, তাঁর অনুকরণাভিলাষীর আবির্ভাব অনপেক্ষিত ছিলোনা—অবশ্য তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা ভিন্ন সওয়াল। এবং শেষোক্ত উদ্ধৃতিতে ব্যক্তব্যবিষয় নয়, আলী সাহেবের অননুকরণীয় অনন্য শৈলীর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মুজতবা-কৃতির মূল্যায়নে তাঁর বিশ্বমানবিকতা ও বর্ণনভঙ্গীর বিশিষ্টতা সঙ্গতভাবেই প্রাধান্য পাবে। এবং এ বর্ণনার আশ্রয় লেখকের অসাধারণ গদ্যরীতি। মুজতবা এ রীতির আবিষ্কারক নন, নিপুণ কারুকার। 'আর রম্যতার বিচারে বক্তব্যের চেয়ে বক্তা তথা বস্তুর চেয়ে রূপের প্রাধান্যই স্বীকৃত। কথাশিল্পীর সংজ্ঞায় ফ্লবেয়র লিখেছেন, 'একটি ভাব প্রকাশের জন্য একটিমাত্র কথা আছে। সেই কথাটি খুঁজে যথাস্থানে বসাতে যিনি পারেন তিনিই কথাশিল্পী।'[৪] বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমাদেরও আলোচ্য 'কথাশিল্পী : মুজতবা আলী।' বাংলা গদ্যের বহমান ধারায় তাঁর অবদান নিরূপণে সর্বাগ্রে বিবেচ্য আলী সাহেবের রচনারীতি, তাঁর স্টাইল। ভাবের আশ্রয় ভাষা—যার উপাদান শব্দ। প্রকাশিত ভাবনায় সুচয়িত শব্দাবলীর যথাযথ প্রয়োগ ও বাগ্‌ভঙ্গিমায় স্টাইলের অনেকাংশ নির্ভরশীল।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে স্টাইলের স্বরূপ সম্বন্ধে। বিষয়টি সম্পর্কে পণ্ডিতদের আলোচনা-আলোড়ন এখনো স্থিত নয়। 'আধুনিক অভিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য ও বাক্যচ্ছটায় শব্দটির ভাষ্য ক্রমশঃ জটিলতর। শুধুমাত্র ভাষা দিয়ে স্টাইল নিরূপণ অনেকটা 'সাজ-পোষাক দিয়ে মানুষ বিচারের সামিল'। J. Middleton Murry মনে করেন, 'Style is organic—not the clothes a man wears, but the flesh, bone, and blood of his body. Therefore it is really impossible to consider styles apart from the whole system of perceptions and feelings and thoughts that animate them.'[৫] বুফোঁর উচ্চারিত "Style is the man" রীতি বা স্টাইলের সংজ্ঞায় বহুল ব্যবহৃত, আলোচিত, আংশিক স্বীকৃত—কিন্তু সর্বশেষ কিংবা চূড়ান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। এ সূত্রাবলম্বনে আলোচনা বিচিত্রগামী হতে পারে। গভীরতায় ডুব না দিয়ে বলা যায়—ভাব, ভাষা তথা শব্দচয়ন, পরিবেশন নৈপুণ্য

ইত্যাদির সার্বিক সমন্বয় ও সংহতির ওপর স্টাইলের নির্ভরতা। অনুধ্যান ও পরিবেশনার মধ্য দিয়েই লেখক আপন স্বাতন্ত্র্যে তথা স্বীয় ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল ও সুচিহ্নিত। অনুভূতি ও বর্ণনার একাত্মতার মধ্যে স্টাইলের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিশেষ কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লিষ্টভাবে স্টাইল হিসেবে চিহ্নিত করা সুসঙ্গত নয়—বড় জোর তা রূপ বা রীতির একটি উপকরণ মাত্র হতে পারে। কেননা, "শব্দালংকার বা অর্থালংকার স্টাইল নয়, নির্ভুল শব্দযোজনা ও বাক্য-রচনা স্টাইল নয়, উপস্থাপনরীতি স্টাইল নয়। এই সবকিছুকে ছাড়িয়েই স্টাইল, তা একাধারে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত, লেখক-ব্যক্তিত্বের শিল্পসম্মত প্রকাশ।"[৬] সুতরাং অনুভূতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশও স্টাইলরূপে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য মতানৈক্য থেকেই যাচ্ছে। "স্টাইলের কোনো সহজ সংজ্ঞা নেই। স্টাইল হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অচেতনভাবে নিয়োজিত সেইসব ভাষাগত উপায়, যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন। বলা বাহুল্য, এ সংজ্ঞা লিখিত ভাষার স্টাইলের।"[৭] স্পষ্টতঃই মৌখিক ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্টাইল ভিন্নতর। বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে আপন গতিপথে ধাবমান ভাষায় স্টাইল বা রচনারীতির বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফুটে ওঠে। সাকার অনুভূতিতে প্রত্যক্ষীভূত লেখক-অবয়বই তাঁর স্টাইলের চূড়ান্ত সাফল্য। নিজেকে প্রকাশের জন্যেই ভাষা আর সে-প্রকাশ শোভন, সুরুচিসম্মত ও লক্ষ্যভেদী করার গরজেই স্টাইলের প্রয়োজন। স্টাইল শিল্পীর স্পর্শে কখনো স্বয়ং প্রকাশ, কখনো বা তার জন্যে প্রয়োজন নৈষ্ঠিক মনন ও কর্ষণ। স্টাইলের বিবিধ গুণাবলীর মধ্যে বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা, নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অত্যাবশ্যক সরসতা তথা প্রসাদগুণ,—সহাস্য-রসিকতা এরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, 'স্টাইলের মূল লক্ষ্য লেখক ব্যক্তিত্বের উদ্‌ঘাটন।'[৮] সার্থক সৃষ্টিতে শুধু রূপকার নন, সমগ্র জাতির রূপ প্রতিফলিত। এবং সাহিত্যের বাহন 'গদ্য' সম্পর্কে, এ বক্তব্য সর্বাধিক প্রযোজ্য। এ গদ্য আমাদের প্রতি মুহূর্তের অনুধ্যানের বাহন, কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে—জীবন-চেতনার নিত্য অনুষঙ্গী। বাংলা গদ্যস্রোতে সম্মিলিত অন্যতম ব্যক্তিত্ব মুজতবা আলীর ধারাটির স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও নির্ভুল স্থান নির্দেশনার প্রয়োজনে বাংলা গদ্যধারার অনুসরণ অত্যাবশ্যক।

০২

পুস্তকাশ্রয়ী বাংলা গদ্য একান্তভাবেই আধুনিককালের নিদর্শন। প্রতিদিনের ব্যবহার্য মুখের বুলি নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক এবং তার রূপ যে ঘরোয়া গদ্য, এ-নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। আমরা পুস্তকধৃত গদ্যের শরণে মুজতবার কৃতি-কৃতিত্বের মূল্যায়নপ্রয়াসী।

পোষাকী ভাষা মাত্রই—তা' সে গ্রন্থেরই হোক, কিংবা মৌখিকই হোক—ন্যূনাধিক কৃত্রিম হতে বাধ্য। পরিশীলিত মনের অনুশীলনের ফসল আজকের দিনের ললিতমধুর শ্রুতিসুখকর কথ্য বাংলা গদ্য। বাংলা গদ্যের প্রধান দু'টো ধারা—সাধু ও চলিত—প্রথমাবধিই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। যদিও প্রাপ্য আসনটির জন্যে চলিত বাংলাকে প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই অতিক্রমণ করতে হয়েছে—রীতিমতো সংগ্রাম করে চলার পথটিকে করেছে মসৃণ। চলিত গদ্যের মূল শক্তি নিহিত আঞ্চলিক শব্দে, লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনে, নিত্য ব্যবহার্য সুভাষিত তথা মৌখিক বুলিতে। মৌখিক বুলির মৌখিক রূপ "কথ্যরীতি···বাঙালির মুখের ইডিয়ম নির্ভর···পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপভেদের উপর সাধু বা কথ্যরীতি নির্ভরশীল নয়···।"[৭] উদ্ধৃতাংশটুকু স্মরণে রেখে আমরাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো, গ্রন্থিত গদ্য প্রথমাবধিই লোকভাষাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী ছিলো। কিন্তু একটা কৃত্রিম দুরতিক্রম্য বাধায় বারবার তার গতি হয়েছে শ্লথ। পণ্ডিতদের অতি সতর্কতা সাধু ও চলিতের ভেদরেখাকে করেছে অধিকতর দুর্লংঘ্য। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দ ও বিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সময়সীমাকে বাংলা গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল বলা যায়। প্রত্যেক সৃজনশীল লেখকই নানাভাবে ভেঙ্গেচুরে ভাষাকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন, বিষয়ানুগ বাস্তবতা দান করে ভাষাকে করেছেন যুগোপযোগী—কার্যক্ষম ও গতিশীল। আপন প্রচেষ্টায় নিজেদের অতিক্রমণের প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। মুনীর চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন: 'বিদ্যাসাগরী গদ্য, আলালী গদ্য, বঙ্কিমী গদ্য প্রভৃতি নামাঙ্কন মোটামুটিভাবে কয়েকটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক হলেও প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউ কোনো একক প্রণালীর গদ্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। প্রত্যেকেই তাঁদের সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের গদ্যরীতির উদ্ভাবন ও অনুশীলন করেছেন।

বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ রচনাসমূহের ভাষা মৌখিক বুলির মতই সরল ও অনর্গল এবং তাতে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। অপরপক্ষে টেকচাঁদের অনেক রচনার বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক, ভাষা সাধু এবং সংস্কৃতানুসারী।[১০] সাধু ও চলিত—কূলপ্লাবী দু'টো সমান্তরাল ধারাই প্রচুর পলিমাটির যোগান দিয়ে বাংলা গদ্যের উভয় কূলকে করেছে সমৃদ্ধ, শস্যশালী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। চলিষ্ণু ভাষামাত্রই পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যানুসন্ধানী। সমাজ, জীবন ও ভাষা অচ্ছেদ্যবন্ধনে অনুস্যূত বলেই সমাজ পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবনচেতনার ধারাবদলেও ভাষার রকমফের অপ্রতিরোধ্য। আমাদের উদ্দিষ্ট বাংলা গদ্য। "গদ্যকে সমসাময়িক হ'তে হয় এবং এ-সাময়িকতার মধ্যেই তাকে বিশিষ্ট হ'তে হয়। একজন লেখকের রচনাশৈলীতে এ-বিশিষ্টতা তখনই অবধারিত হয় যখন তিনি ঘটনা বা কর্মের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটি রসাশ্রিত চিত্র উপস্থিত করেন।"[১১] সদৃষ্টান্ত আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করবো।

১৭৪৩ খ্রী. রোমান হরফে মুদ্রিত মানোএল-দা আস্‌সুম্‌ সাম বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'-এ পূর্ববঙ্গের কথ্যরীতি সুস্পষ্ট এবং কালের বিচারে বইটির সারল্য প্রশংসনীয়। আঞ্চলিক বুলির সঙ্গে ব্যবহৃত ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দ সুসংবদ্ধ। যথা,—

> ক. 'হিসপানিয়া' দেশে মাদ্রিদ শহরে দুই কলিম পুরুষ আছিল। বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল, দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিনে ছয় ঘড়ি দুই প্রহর বাদে তাহার জনে-জনেরে নাগাল পাইল। দুইজনেও তরোয়াল খসাইয়া মারামারি করিল। যে জানে বেশ তেজবন্ত, সে আরও একচোট দিল, সে মাটিতে পড়িয়া রহিল, পরাজয় হইল।[১২]

> খ. ফ্লান্দিয়া দেশে এক সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল; লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল; এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতা মাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল; তাহার এক বইন আছিল; তাহারে পন্থে লাগাল পাইল; ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল: তুমি নি আমারে চিন? না ঠাকুর, বইনে কহিল।' ··· পিতায় 'অচিনা পুত্রেরে বাসা দিল, তাহার ধন দেখিয়া ধনের লালসে তাহারে রাত্রে

বধিল, এবং তাহারে মাটি দিল, ধন লুকাইয়া রাখিল। আর দিন বড় প্রাতঃকাল পিতা মাতার বাড়ীতে বইনে গেল। পিতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাইয়ে কোথায় গেল ? আমি কইল্ল রাত্রে তাহারে দেখিলাম, হাঁটিয়া যাইতে; তাহার নাগাল পাইলাম, আমার লগে কথাবার্ত্তা কহিল। এহা শুনিয়া পিতা কাঁদিতে লাগিল; মাগেরে কহিল, করিয়াছি আমরা ? আমারগো পুত্র বধিলাম ; অভাগিয়া হইয়াছি পৃথিবীর মধ্যে! এমত ধরান কান্দিতে কান্দিতে দুই জনে মাগ ভাতার অভরসা হইল : অভরসা হইয়া, যেন পাতকে আর পাতক জন্মে, পিতা আপনে আপনেরে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিল, মাতায় ছুরি দিয়া আপনে মরিল, এবং দুই জনে নরকে গেল।[১৩]

এ ভাষাকেই প্রাকৃত বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এখানে অবলীলায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ গলাগলি হয়ে ভাবনাকে ব্যঞ্জনামধুর করেছে, কথনভঙ্গিও প্রাঞ্জল। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালীর প্রথম গ্রন্থটিও সমকালীন কথ্য বাংলার অকৃত্রিম নিদর্শন। পুস্তকটি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৯০১), গ্রন্থকার রামরাম বসু (১৭৫৭১৮-১৩)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতদের মতো রামরাম বসুও উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দু'টো গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। লিখিত গদ্যের কোন নিদর্শন তাঁর সম্মুখে ছিলো না। ফলে তাঁকে বাংলা গদ্য নির্মাণ করতে হয়েছে এবং এ দুরূহ কর্মে তিনি বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। গদ্য দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বাহক—এ সত্য তিনি প্রথমাবধিই স্বীকার করেছিলেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট ভাষা মৌখিক বুলির অনুগামী। বিষয়ানুরোধে ফার্সীতে ওয়াকিফহাল মুন্সীর লেখা স্বভাবতঃই ফরাসীবহুল। এবং সে-সমস্ত ফার্সী শব্দ তখন লোকমুখে বহুল প্রচলিত। ফলে তাঁর 'ভাষালোক-সংযোগ হারায়নি'। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'র (১৮০২ খ্রী.) গদ্য আরো প্রাঞ্জল ও অধিকতর মুখের ভাষার নিকটবর্তী। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার নিদর্শন :

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাৎ

হইলে হেন্দোস্তানে বাদশাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ লইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহ্‌শিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।[১৪]

ধ্বনির অনুসরণে যতিচিহ্নের সুপ্রয়োগের জন্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু রামরাম বসু তাঁর ভাষার জন্যে সমসাময়িক ও ঈষৎ পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। এমনকি 'যাবনিক' শব্দাধিক্যের জন্যে কারো কারো বিবেচনায় তাঁর পুস্তক 'অপাঠ্য' 'কুৎসিত'! অবশ্য ইদানিংকালে তাঁর কৃতি-কীর্তির যথাযোগ্য মূল্যায়ন হয়েছে এবং বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর মর্যাদা ও স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।—

'It is true that Basu did use Persian words. There are few, if any Bengali writers who have not done so. It is however far from the truth to suggest that what he wrote was more Persian than Bengali or that he used Persian words haphazardly and without reference to context as some critics have alleged. One should bear in mind the linguistic situation of the period and judge Basu's Vocabulary against tnht back-ground. Before 1801, Persian had been the language of the Courts, and it continued to be so till 1835. Legalistic terms and expressions in Bengali were borrowed frrely from Persian or Arabic, and in addition to words of this class a considerable number of Persian words were and still are used in everyday Bengali speech and have, as a result, become phonologically naturalised in the language.'[১৫]

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রী.) তত্ত্বাবধায়নে লিখিত ও তাঁর নামে প্রকাশিত 'কথোপকথন' (১৮০১)-এ বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা হুবহু ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যথা :

ক. স্ত্রীলোকের কথোকপথন

আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কালাইর ডাল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিতে নিতে। তাইতে শাকের ঘন্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্বল হইয়াছিল। (বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক [অতঃপর শুধু 'পদাঙ্ক'],পৃ. ২)

খ. কন্দল

হ্যাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডাখাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাডে। [পদাঙ্ক, পৃ.৩]

কেরীর ওপর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রভাব গাঢ়তর হওয়ার ফলে তাঁর ভাষা ক্রমান্বয়ে সংস্কৃতানুগ হয়েছে। তবে তা কখনো দুর্বোধ্য নয়। বরঞ্চ কেরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা'-য় (১৮১২) পরবর্তী-কালের পাঠ্যপুস্তকের অনাড়ম্বর আটপৌরে গদ্য রূপের পূর্বাভাস:

কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতে ছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন। নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেন আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে। (পদাঙ্ক, পৃ. ৪)

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য ছিলো অবশ্যম্ভাবী এবং বাংলা গদ্যে তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রধানতঃ তাঁর হাতেই গদ্য বিদগ্ধ ও নাগরিক হয়ে উঠলো। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রদর্শিত পথেই ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সগর্ব পদচারণা। তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২)-এর ভাষা:

> রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জলপান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। (পদাঙ্ক, পৃ. ৫)

এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য মুখের বুলি থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃত্রিম শিষ্ট ভাষা রূপে পুস্তকে আশ্রয় ও পণ্ডিতজনের প্রশ্রয় লাভ করে। এবং এভাবে আধুনিক গদ্যের জন্মলগ্ন থেকেই তা' দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে সাধু ও চলিত নামে দু'টো ধারার সৃষ্টি করে। সাধু-পন্থীরা তখন থেকেই পরিমার্জনার নামে বহুল প্রচলিত বহিরাগত ও লোকজ শব্দসমূহ ভাষা থেকে বিতাড়নের পালা শুরু করেন। 'কিন্তু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে বাংলা গদ্যের এই শুদ্ধিকরণ—তার শক্তি, বৃদ্ধি তো করেইনি, বরং জাতি হিসেবে তাকে দুর্বল করেই ফেলেছে।'[১৬] তবে বিদ্যালঙ্কারের লেখনী ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলো সর্বাধিক শক্তিশালী এবং তাঁর ভাষাও প্রসাদগুণসম্পন্ন। তদুপরি বিষয়ানুযায়ী শব্দপ্রয়োগে তিনি যে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন না তার প্রমাণ 'রাজাবলি'-র (১৮০৮) উদ্ধৃত স্তবকটি :

> তদনন্তর নবাব সিরাজদ্দৌলা আপন লোকদের ব্যবহার অনুসন্ধান করিয়া শঙ্কা ও ভয়েতে অতিশয় সাতঙ্ক হইয়া পাটনার নায়েব সুবেদার রাজা রামনারায়ণের আরজিমতে ঐ রাত্রিতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জিলোখানাতে কোনহ সরদারকে হাজীর হইতে না দেখিয়া কেবল এক প্রাচীন বৃদ্ধ সরদারকে শও চারি পাঁচেক বিরাদারি সমেত হাজীর হইতে দেখিয়া এক খাস পলোয়ারে কএক খেদমৎগার সমেত সওয়ার হইয়া আজীমাবাদ প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাজমহলের নিকট পঁহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিঞ্ছু খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্তে একজন চাকরকে নৌকা হইতে নামাইয়া দিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল সে পূর্বে মুরশিদাবাদে একজন মর্দ্দ আদমি ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ

মুড়াইয়াছিলেন এই অপমানে সে ব্যক্তি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল···। (পদাঙ্ক, পৃ. ৭)

মোটামুটিভাবে নির্দেশ করা যায় যে, পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যের ত্রিবেণী—সাধারণ জনের মৌখিক বুলি আরবী-ফার্সী শব্দবহুল বৈষয়িক ভাষা এবং তৎসম প্রভাবান্বিত সংস্কৃতানুগ পদ ও বাক্যগঠন রীতির উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের হাতেই। এবং কথোপকথন, প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও বত্রিশ-সিংহাসন—এই ত্রিধারার প্রতিভূ হিসেবে বিচারযোগ্য। এই বৃত্তে বাংলা গদ্য বর্তমানেও আবর্তিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মনে করেন, "মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিন জন লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল।"[১৭] তবে সংস্কৃতানুগ ভাষার জৌলুসে অন্য দু'টো স্রোত প্রায় ক্ষীণকায়া হয়ে পড়ে এবং পণ্ডিতবর্গের বিমাতৃসুলভ আচরণ ও বিধান ছিলো তাদের পরিপুষ্টির প্রতিকূল। এমতাবস্থায় নোতুন জোয়ার আনলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩)। সমকালীন জীবনচিত্র রচনায় চরিত্রানুগ কথ্যভাষা ব্যবহার করে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ তিনি নবীন প্রাণ সঞ্চার করলেন। বর্ণনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো জীবন্ত এবং প্রায় স্বাভাবিক। ঠকচাচা ও চাচীর আলাপনে তাদের সংসারালেখ্য প্রাণবন্ত:

> যেমন দেবা তেমনি দেবি—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দু'জনেই রাজযোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু ২ গুমর হয়, তাহার নিকট স্বামীর নির্জলা মান পাওয়া ভার, এজন্যে ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর খড়ি বলো যে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড়ো চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুতেই দেখি না তুমি দেয়ানার মতো ফের— চুপচাপ মেরে হাবলিতেই বসেই রই। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ

> বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেত্‌না ফিকির—কেত্‌না ফন্দি—কেত্‌না প্যাঁচ—কেত্‌না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এস এস হয় আবার পেলিয়ে যায়।[১৮]

তদ্ভব, চলিত বিদেশী শব্দ এবং কথ্যরীতির ইডিয়ম ও প্রবাদ-বাক্যের ব্যবহারে প্যারীচাঁদ 'আলালের' ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করতে চেয়েছেন। আবার 'রামারঞ্জিকা' প্রণয়ন করে তিনি প্রমাণ করলেন ভাষা হবে বিষয়ানুগ। যেমন,—

> রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর নিস্তব্ধ। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ু সংহারকভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্যমান। নদীর সলিল কল কল রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরুচূড়ার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে যাইতে পারে?'
>
> (পদাঙ্ক ক. পৃ. ৩১)

একই কারণে 'আলালে'র বাঞ্ছারাম, বরদাপ্রসাদ কিংবা বেণীবাবুর ভাষাও ঠকচাচার সমধর্মা নয়। আলালীভাষা নিঃসন্দেহে নোতুন দিক-নির্দেশক। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আলালে' কিছু গ্রাম্যতা, যথা, "টক্‌টক্ পটাস্ পটাস্ মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া লেজ মুড়োইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে"—দোষের উল্লেখ করেও এ ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তখনি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "জীবন্ত মানুষ ও ভাষা যত কাছাকাছি থাকে ততই ভাল।"[১৯] দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) প্রহসনেও আঞ্চলিক ভাষার সুকৌশলী প্রয়োগ সবিশেষ উল্লেখ্য। অতঃপর বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৩০-৭০) আবির্ভাব রীতিমতো বিদ্রোহের নামান্তর। প্রচলিত রীতিনীতি ও তথাকথিত শালীনতাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুধুমাত্র দুর্মর প্রাণশক্তির বলে বাংলা গদ্যকে তিনি চাঙা করে তুললেন। খাস্ কলকাত্তাই উপভাষা

হলো 'হুতোমে'র বাহন। কথ্যভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে স্ল্যাঙ্ বা অভব্য শব্দ ব্যবহৃত হলো নির্বিচারে। আলালী ভাষা প্রকৃত পক্ষে চলতি রীতির সরল সংস্করণ। কিন্তু সর্বজনবোধ্য নির্ভেজাল মৌখিক ভাষার প্রথম পুস্তক 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬২) এবং রচনাটি আধুনিক গদ্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনিই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে বুঝেছিলেন, 'বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর মুখে।'[২০] ভাব ও চরিত্রানুগ শব্দ ব্যবহারে হুতোম বাস্তব ধ্বনির প্রাধান্যকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন। ফলে প্রথাগত বানান ও মৌখিক সংস্কার প্রতিপদে বিড়ম্বিত, ভদ্রজনের রুচির তোয়াক্কাও তিনি করেন নি। হুতোমে অনুসৃত সত্য রাজশেখর বসুর ভাষ্যেও সমর্থিত—'মৃত ভাষা ব্যাকরণের বন্ধনে মমির মতন অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু সজীব চলন্ত ভাষার বিকার বা পরিবর্তন ঘটবেই।'[২১] সচল প্রাণবান এই ভাষাই হুতোমের লক্ষ্য। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদ্ধৃতি :

ক. 'সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।'[২২]

খ. 'শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাছ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামছা কাঁধে, ভালো মাছ নিবি?" "ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্ছেন।'[২৩]

গ. 'নদের চাঁদ গোস্বামী বোস্ বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতনফক্কা।। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাকে হেগে দিয়েচে।'[২৪]

ঘ. 'গাঁয়ের জমিদার মজফফর খাঁ···মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতিরও সেলামালকীর গুণা কত্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন,···মজফ্ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয়।'[২৫]

বাঙাল ভাষার ব্যবহারেও হুতোমের কেরামতিকে সালাম জানাতে হয়। গাড়ীতে সুরামত্ত বাবুদের রাসভ-সঙ্গীতে আকৃষ্ট ঙ. 'দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো, কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন যে, তখনো তান মারা থামেনি। ···সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা নগ্দা মুটে ঝাঁকা কাঁধে করে বেকার চলে যাচ্ছিল, এই ব্যাপার দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে "পুঙ্গিরবাই গাড়ি মদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন" বলে চলে গেল।'[২৬]

বিপুল প্রাণশক্তিতে ভরপুর অদম্য এ ভাষার গতি রোধ দুঃসাধ্য। তবু সমকালে রুচি-শালীনতার ছুঁৎবাই-এর দোহাই দিয়ে নবীন-ভীতি ও প্রাচীন প্রীতিতে নিমজ্জিত গোষ্ঠী বিশেষের সক্রিয়তায় হুতোমী রীতির যাত্রাপথ সুগম হয়নি। তবে হুতোমী ঢেউ যে আন্দোলন সৃষ্টি করলো তা' অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং বাংলাগদ্যের জন্যে কল্যাণপ্রদ। গদ্যের রূপ রীতি নিয়ে প্রবল মতানৈক্যে দুটো দলের সৃষ্টি। এক গোষ্ঠী তৎসম শব্দ কণ্টকাকীর্ণ সাধুভাষার প্রবক্তা, বিরোধী পক্ষ মুখের বুলিকে যথাসম্ভব পুস্তকে স্থান দানের পক্ষপাতী। প্রথমদিকে 'সাধুজী'দেরই ছিলো প্রবল প্রতাপ এবং সমাজও তাঁদের মান্য করেছে। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) উভয় রীতির মধ্যে শৈল্পিক ভারসাম্য আনয়নে সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি প্রাচীন সাহিত্যের রসনৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ পরিমাণবোধ, মার্জিত রুচি ও বিষয়োপযোগী শব্দ প্রয়োগে ভাষাকে আভিজাত্য দান করে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশক্ষম করে তুললেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের রচনায় আভিধানিক শব্দের প্রচুর সমাবেশের মধ্যে প্রচলিত আরবী-ফার্সী ও লোকজ শব্দের সমাহার তাঁর গোঁড়ামিমুক্ত, দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। বিষয়ানুগ ভাষা তাঁর ইচ্ছায় রীতিমতো নৃত্যপরায়ণ। বেনামীতে বিদ্যাসাগরের বেপরোয়া রচনা আজও তুলনাহীন। 'একই কালের কত সাধারণ সহজ উক্তি,

প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান,—এমনকি, সেদিনের গ্রাম্য রসিকতায়ও তিনি মুখর।'[২৭] 'সীতার বনবাস'-এ তৎসম শব্দসম্ভারে পরিপুষ্ট মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ অশ্রুসিক্ত কোমল ভাষায় হৃদয়াকূতি, 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ প্রাত্যহিক জীবনের সাদামাটা ভাষা এবং বেনামী রচনায় হাস্য-কৌতুকাবহ প্রতিবেশ সৃষ্টি ও প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার অসাধারণ নৈপুণ্যে বিদ্যাসাগরী রীতি অভূতপূর্ব। বিভিন্ন শ্রেণীর গদ্যশৈলীর দৃষ্টান্তেই বক্তব্যের প্রমাণ।—

ক. 'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি। এই গিরির শিখরদেশে আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।' (সীতার বনবাস, পদাঙ্ক; পৃ. ৪৫)

খ. 'প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন।' (বিদ্যাসাগর চরিত—স্বরচিত, পদাঙ্ক, পৃ. ৫৯)

গ. তহবিলে টাকা নাই, খাজনা দাখিল হইতেছে না; এজন্য জমীদার দেওয়ানজিকে ডাকাইয়া কহিলেন, আর সময় নাই, খাজনা দাখিলের কি করিতেছ।...তখন দেওয়ানজি কহিলেন, আপনি অকারণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন। কালেক্টর সাহেব নিলাম করিয়াছেন, করুন; গোলাম দখল দিবে না। সেইরূপ, খুড় ভুলিয়াছেন বলিয়া, পৃথিবীশুদ্ধ লোকে ফয়তা দিলেও, খুড় দখল দিবেন না। খুড়ের গুণের বালাই লয়ে মরি।

...এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল !!!'[২৮]

ঘ. 'উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্গে বিচার করতে পিছপাঁও হইবেন, যদি কেহ, ভুল ভ্রান্তিতেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড়

মানী, যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মত টুকটুকেই হউক, আর রামছাগলের মত চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিতই হউক, ঠাস ঠাস করিয়া, দশ-বার জোড়া চড় মারিয়া, সেই বেআদবকে, চিরকালের জন্য, দুরস্ত করিয়া দিব। ইহার জন্যে যদি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুরক্ষিণীসভা দেবীর সূক্ষ্মবিচারে, ও অকাট্য ফয়তা অনুসারে, ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর।'[২৯]

আলালী ও বিদ্যাসাগরী ধারার সুসমন্বয় করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪) অনুপম নিজস্ব গদ্যরীতি উদ্ভাবন করলেন। ভাষায় দার্ঢ্য ও শ্রী মনোহর হয়ে উঠলো। প্রাধান্য পেলো যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণ প্রবণতা। আবেগ নিয়ন্ত্রিত মননের প্রাবল্যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হলো বিচিত্র শব্দসম্ভারে। প্রয়োজনে সংস্কৃত, দেশী-বিদেশী শব্দের অবাধ ব্যবহারের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং আপন সৃষ্টিতে তা প্রয়োগ করে ভাষাকে করলেন গতিময় ও প্রোজ্জ্বল। অবশ্য সমালোচকেরও অভাব হয়নি। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া' বলে, কেহই "শবপোড়া' বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী।'[৩০] এঁরা শ্রুতির দাবী স্বীকার করেননি। এঁদের যুক্তিতে 'সোনারতরী' অচল, বিশুদ্ধি রক্ষায় 'সোনার নৌকা' অথবা 'স্বর্ণতরী' লেখা বাঞ্ছনীয়। আলাল-হুতোমের অভ্যুদয়ে সৃষ্ট কথ্য-লেখ্য ভাষার যে দ্বন্দ্ব, বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশক অবধি তার জের অব্যাহত ছিলো। সৈয়দ এমদাদ আলী চলতি রীতির সুবর্ণ যুগেও 'বাংলা ভাষা ও মুসলমান' নিবন্ধে ভরসায় বুক বেঁধেছিলেন, "আমরা এ কথা বলি না যে, বীরবলী ভাষা অচল, অকেজো, উহা চলিতেছে, চলুক। উহাকে গতি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এই সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলির পোনে ষোল আনারও বেশীর ভাগ লেখ্য ভাষার প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিতেছে।'''কথ্যভাষার

প্রচলন চেষ্টা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। এই উচ্ছ্বাস জল বুদ্বুদের মত কালের বুকে মিলাইয়া যাইবে।' (মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৪)।[৩১]

সামান্যতম সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও অনেকে ছিলেন অগ্নিশর্মা। ১৯৪৫-এ বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সদম্ভ ঘোষণা: 'আধুনিক ভাষায় ক্রিয়া-পদকে পূর্বে দিয়া, কতকগুলি চলিত কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়া সমাজস্থ করিবার প্রবল প্রচেষ্টা চলিলেও ভবিষ্যৎ বাঙালী জাতি ইহা সহ্য করিবে না।'[৩২]

আরো একটি বিতর্ক ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছিলো। সংস্কৃতানুরাগী সাধুপন্থীদের অনুরূপ রামরাম বসু ও তাঁর অনুকারীদের অনুসরণে কিছু সংখ্যক মুসলমান লেখকও আরবী-ফার্সী শব্দ দেদার এস্তেমালে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ফলে শব্দব্যবহারেও একটা ধর্মীয় চেতনা হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মাথা চাড়া দেয়। অবশ্য এর ফল যে শুধু মন্দ হয়েছে এমন বলা যায় না। বরঞ্চ তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে দুর্বল বাংলা গদ্য ক্রমশঃ বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে। এ বিষয়ে শিল্পী বঙ্কিম যথাযথ পথ-নির্দেশ দিয়েছেন:

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায় অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য।···অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দে একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।···বলিবার কথা-গুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।[৩৩]

বঙ্কিম অনুসৃত রীতির সার্থকতা তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' কিংবা উপন্যাসের সঙ্গে 'লোকরহস্য' অথবা 'কমলাকান্ত'-র ভাষার তুলনাত্মক আলোচনায় অনুধাবনযোগ্য। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি শিল্পীর এই সুকুমার অনুভূতিকে

সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে পারেনি। অবশ্য সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য তার সঠিক পথই গ্রহণ করে। বঙ্কিমের সমকালীন শ্রেষ্ঠতম মুসলমান গদ্যলেখক মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'বিষাদসিন্ধু (১৮৯০) তে এই শিল্পরীতিরই অনুসৃতি।—

'ঘোরনাদে শব্দ হইল—"মহম্মদ হানিফা"!

নিজ নাম শুনিতেই মহম্মদ হানিফা একটু থামিয়া দক্ষিণ বামে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।···স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, যেন আকাশ ফাটিয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া শব্দ হইতেছে,---"হানিফা! একটি জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা তুমি জান?···এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্ত হইল না! জয়ের পর বধ, ইহা অপেক্ষা পাপের কার্য আর কি আছে? নিরাপরাধ প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুল্‌দুল্ সহিত রণবেশে, রোজকেয়ামত পর্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক।"[৩৪]

প্রসাদগুণ বজায় রাখতে লেখক যেমন 'ঈশ্বর'-এ বিশ্বাসী, তেমনি 'রোজকেয়ামত' প্রয়োগেও নিঃশঙ্ক।

মাতৃভাষার প্রতি দেশজ মুসলমানের এককালের অকারণ অবজ্ঞা নবতর ভাবাবেগে সুদে-আসলে মিটিয়ে দিতে একদলের উৎসাহ আতিশয্য তখন তুঙ্গে এবং নিজেদের অধিকার প্রয়োগের প্রাবল্যে তাঁদের অনেকের দৃষ্টিতেই আঁধি। ১৩২৪-এর "আল্‌-এস্‌লাম' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্যা' প্রবন্ধে এসমাইল হোসেন সিরাজী লিখলেন :

'বাঙ্গালা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও, মোছলমানই তাহাকে আদর করিয়া রাজ সিংহাসনের পার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু মাতা তাহাকে লেংটি বা ধুতি পরাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মোছলমান আসিয়াই তাহার লেংটি খুলিয়া আচকান পাজামা, চোগা ও টুপীতে তাহাকে শাহজাদা করিয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দু মাতা কেবলমাত্র কপালে তিলক কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, মোছলমান আসিয়াই আতর গোলাব গন্ধে সুরভিত করিয়াছেন।'[৩৫] আরবী-ফার্সীর গৌরবে লেখক মাতোয়ারা এবং

তাঁর বিবেচনায় বাংলায় এ-সব ভাষার শব্দ-সাজসজ্জা অপরিহার্য। আগস্ট, ১৯২৩ সংখ্যার 'ছোলতান' পত্রিকায় সিরাজী সাহেব লিখেছেন: 'রবীন্দ্রপন্থীরা ভাষাকে যেমন কোমল করিতে যাইয়া কমজোর ও রুগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, মোছলমানের তাহা অনুকরণযোগ্য নহে।···আমরা যদি বাঙ্গালা ভাষাকে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বীর ভাষা করিতে চাই, তাহা হইল তাহাকে আরবী তাজী ঘোড়ায় চড়াইয়া লাঙ্গা শমসের হাতে দিয়া জঙ্গের ময়দানে কুচকাওয়াজ পাঁয়তারা ভাজা শিখাইতে হইবে।'[৩৬]

এ-বিষয়ে সংস্কৃতপন্থীদের বিবেচনা বিহীন একদেশদর্শিতা ও অনুদারতা যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছে। তাঁদের প্রয়াস সফল হলে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সরল সংস্করণে রূপান্তরিত হতো মাত্র। আমাদের সৌভাগ্য, উভয় সম্প্রদায়ের বিবেকবানদের বাস্তবানুগ সুযৌক্তিক পদক্ষেপ এ সংকট উত্তরণে সহায়ক হয়েছিলো। 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', বৈশাখ ১৩২১-এ 'বঙ্গভাষার গতি' নিবন্ধে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী লিখেছেন: 'বর্তমানে লিখিত বাংলা ভাষায়, যতদূর সম্ভব, হিন্দু মুসলমানের ব্যবহৃত কথিত বাংলার প্রচলন করিতে হইবে। বাংলা ভাষাকে প্রাণহীন, গৌরবহীন করিয়া আমরা কোন পরিবর্তন চাহিনা। এই পরিবর্তন-চেষ্টার ফলে অনেক আরবী-ও পারসী শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পাইবে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের তাহা সহিয়া লইতে হইবে। আমরাও বর্তমান মুসলমানী বাংলা হইতে অনেক অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দ ত্যাগ করিয়া বহু সংস্কৃত শব্দ আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

··· ··· ···

আমরা হিন্দু বাংলাও চাহিনা, মুসলমানী বাংলা ও চাহি না; আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে বুঝে।'[৩৭]

১৩৩৬-এ প্রকাশিত 'মোয়াজ্জিন'-এর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিভাষণের অংশ বিশেষ: 'এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। ···তেমনি অন্যদিকে আর এক শ্রেণী আছে, তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী-ফারসী-উর্দু-বাংলার এক অপূর্ব খিচুড়ী।···এই দুই দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতেই হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। ···আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।'[৩৮]

ভাষা বিতর্কে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩১) মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ'-এ। তাঁর অভিমত:

'বাঙ্গালা—বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভষা, সুতরাং এই ভাষায় প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দু-মুসলমানদের প্রভাব বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।···

···হিন্দুর লজ্জার সহিত মুসলমানের শরম, হিন্দুর ধনের সহিত মুসলমানের দওলত, ভারতীয় মাতার সহিত তুর্কীর পিতা, বাঙ্গলার ঝড়ের সহিত পারস্যের তুফান এবং হিন্দুর হাসির সহিত মুসলমানের খুশি যেন গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। মুসলমানের জোর জুলুম এবং চালাকী ও আহমকী পর্যন্ত হিন্দুরা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।'[৩৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২–১৯৩১), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) প্রমুখ বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতযশা দিক্‌পালদের নির্দেশনা ও পদাঙ্ক অনুসরণেই আজকের সুললিত, সর্বকর্মক্ষম, বাংলা গদ্যের অব্যাহত জয়যাত্রা। ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মও সেই খাতের অনুগামী। প্রমথ চৌধুরী দ্বিধাহীন কণ্ঠে 'আমাদের ভাষা সংকট'-এ লিখলেন:

> আমরা হচ্ছি কৃষিজীবী জাত, অথচ 'জমি থেকে 'ফসল' পর্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয় আরবি। আর জমিদারি সংক্রান্ত সকল কথাই ঐ আরবি-ফারসির দান; ও-ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশমাত্র নেই।···আমাদের কর্মজীবনের যা চূড়া, আইন-আদালত, তার ভাষাও আগ-াগোড়া আরবি-ফারসি। আরজি থেকে রায় ফয়সালা পর্যন্ত মামলার অদ্যোপান্ত সকল কথাই বাংলা ভাষায় মুসল-মানের দান। ইংরেজরা আজকাল ডিক্রি দেন বটে, কিন্তু তা 'জারি' করতে হলেই ইংরেজী ছেড়ে ফারসীর শরণাপন্ন হতে হয়।"[৪০]

অতঃপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতায় ভাষার সাময়িক পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

> তাঁদের (পণ্ডিতদের) ঐ তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাংলা ভাষা থেকে শুধু যে আরবি-ফারসি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তদ্ভব কথাও সাহিত্য থেকে বহিষ্কৃত হল।···বাংলা ভাষার উপর এই আর্য অত্যাচার বাঙালি যে বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি, তার সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ ষাট বৎসর আগে বাঙালির ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্য জগতে জ্বলজ্বল করছে। আলালের ঘরের দুলাল আর হতোম প্যাঁচার নক্‌সা যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।[৪০]

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে শিল্প-নৈপুণ্যের প্রাধান্য। বক্তব্যের চেয়ে উপস্থাপনা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। ফরাসী সাহিত্যের এই রসবোদ্ধা ভাষাকে করতে চেয়েছেন স্বচ্ছ ও গতিময়। প্রকৃত পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর মেজাজটিই ছিলো ফরাসী ধাঁচের। তাঁর মনন-মানসিকতার আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রচনার ছত্রে ছত্রে। মৌখিক ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার লক্ষ্যেই 'সবুজ পত্র'-এর আবির্ভাব ১৯১৪ সালে। এর প্রভাব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। গদ্য সংক্রান্ত কোন রকম ধোঁয়াশার লেশমাত্র প্রমথ চৌধুরীর রচনায় নেই। কথ্য ভাষাই তাঁর লক্ষ্য। লিখেছেন : 'বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হ'তে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে'।[৪১] এবং তিনি চেয়েছিলেন শানিয়ে ভাষার ধার বাড়াতে। প্রবাদ-প্রবচন, আপ্ত বাক্যের ব্যবহারে, শ্লেষ-উপমা ও বাগবৈদগ্ধ্যের ব্যঞ্জনায় এবং অনুপ্রাসের ধ্বনিতরঙ্গে প্রমথর গদ্য ক্ষিপ্রগামী, দ্যুতিময়। কথ্যভাষা ব্যবহার করছেন, কিন্তু গ্রাম্যতাকে আমল দেননি। তাঁর রচনাও আভিজাত্যধর্মী। অবশ্য এ আভিজাত্যে প্রবেশাধিকারের জন্যে প্রয়োজন বিশেষ রুচি, মার্জিত রসবোধ এবং

বৈদগ্ধ্য। প্রমথর মজলিস সাধারণের জন্যে নয়। তাঁর ভাষাতেও আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ঢঙটি কথ্য ভাষার হলেও রূপের ছটায় বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের সগোত্র। এবং কোনক্রমেই তা সাধারণের নিকট অনায়াসবোধ্য নয়। এখানেই বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর কৃত্রিম রচনার মৌলিক পার্থক্য। 'অসাধারণ দার্ঢ্য ও শিল্পচেতনা প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর পাঠকদের মধ্যে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করেছে। 'প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভাষা-য় বিজিতকুমার দত্তের অনুভূতির সঙ্গে আমাদেরও সম্পূর্ণ ঐকমত্য : 'আত্যন্তিক শিল্পনিষ্ঠাই চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যের কৃত্রিমতার কারণ। শিল্প স্বাভাবিকতাকে বর্জন করে না। কিন্তু প্রমথ চৌধূরীর মনন এবং একজতীয় অহংবোধ—তাঁর রচনাকে স্বাভাবিক হতে দেয়নি।'[৪২] প্রকৃতপক্ষে প্রমথ চৌধুরী আপাদমস্তক বিশুদ্ধ নাগরিক বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠতম বাঙালী প্রতিভূ। ভাষাবিষয়ক চিন্তা-ভাবনা তখন অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুস্পষ্ট 'অভিভাষণ':

> সাত শত বৎসর মুসলমানদের সহিত একত্র বাস করিয়া বাংলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাংলার হাড়ে মাংসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না।... আমাদের বাংলা বিভক্তির 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি, তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কী করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করিবেন না।. . .
>
> আবার একদল আছেন, তাহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—'ওটা ইতুরে কথা।' উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান।...
>
> ...বাংলায় যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাংলা কী হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। ...লেখক-দিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না।...যাহা চলতি যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা

> চলতি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরাজিই হউক, পারসিকই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়ে'কে 'লৌহ বর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।[৪৩]

উল্লিখিত রীতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করি শাস্ত্রীর 'মুসলমানী বাঙ্গালী শুদ্ধ্ উজ্জ্বলবিবির কেচ্ছা-য়': '...বিবি নেমাজ করিয়া হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হানিফা আপন পচিয় দিল। বিবি বলিলেন, তুমি যে নবীর খান্দান, তাহার পরিচয় কিসে পাইব? আমি তোমায় কতকগুলি সওয়াল করি, তুমি তাহার জবাব দাও।'[৪৪] ক্রিয়াপদে সাধুরূপ ব্যবহৃত হলেও এ-ভাষা সাচ্চা মৌখিক বুলির অনুকূল। ভাষার সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গিমায় এ-রীতির অপরিহার্যতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯) বহু পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। সাধুভাষার আবরণে দৈনন্দিন জীবনের শব্দাবলী তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্থান পেয়েছে। যথা:

ক. 'আমাদের গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে কচপুরের স্বরূপ সরকেলের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। কাপড়ের দোকানে যখন কাজ করিতাম, তখন তিনি আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। কাপড়ের দাম লইয়া তিনি বড় হেঁচড়া-হিঁচড়ি কচলা-কচলি করিতেন না।'[৪৫]

খ. '...বন পার হইয়া সে উপরে উঠিল; ...যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সে ঘাটের দিকে দৌড়িতে লাগিল। কাঁটা খোঁচায় তাহার পরিধেয় কাপড় ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল; ...'[৪৬]

গ. 'ঝি আসিয়া সমস্ত কথা প্রভাবতীর পিতা মাতাকে বলিল। মুস্তফি মহাশয় একবার মনে করিলেন যে, আদালতে নালিশ করি কিন্তু কাছারিতে তিনি কি করিয়া হাজির করিবেন।'[৪৭]

ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপ ব্যতীত বাংলা গদ্যের ঐ চলিত রূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৫৪), ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২) প্রমুখের রচনায় ধারাবাহিত হয়ে এ-রীতিকে বহুমাত্রিকতা দান ক'রে

বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনঘনিষ্ঠ কথ্য ভাষাকে সর্বস্তরে প্রয়োগ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মনে সামান্যতম দ্বিধা-সংকোচ ছিলো না। 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধে বলেছেন, 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা, ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে।···ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'[৪৮] এ-সত্য স্বামীজীর রচনায়ও প্রতিফলিত।—

"···এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হ'তে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল।"[৪৯]

উইট-হিউমার সহযোগে বহিরাগত শব্দ, লোকজ ইডিয়ম ও অভব্য বাক্-ভঙ্গিমার সুসঙ্গত প্রয়োগে ভাষা যে কতো চিত্তহারী, গতিশীল ও বাস্তবধর্মী হতে পারে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের দু'জন বিশিষ্ট লেখকের রচনা থেকে তার স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পরে।—

ক. 'সেজন্যে অভিভূত হইয়া বছিরুদ্দি, ফেকু এবং ঝোঁটি দন্তবিকাশ করিয়া বারবার সেলাম করিল এবং খোদা ও কালীমায়ীর নিকট বাবুজীদের তরক্কী প্রার্থনা করিল।

···   ···   ···   ···

···যদিও লোকে তাঁকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম ম্রেদম খাঁ। তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ···তাদের আদি নিবাস ফরিদপুর নয়—আরব দেশে, যাকে বলে তুর্খ। সেখানে সকলে লুঙ্গি পরে এবং উর্দু বলে, কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে। সেই আরবদেশের মধ্যিখানে ইস্তাম্বুল, তার বাঁয়ে শহর বোগদাদ।··· বোগদাদের দখিনবাগে মক্কাশরীফ, সেখানকার পবিত্র কুয়ার জল

আব-এ-জম্‌জম্ তাঁর কাছে এক শিশি আছে। মনিব যদি হুকুম দেন, তবে সেই জল ছিটাইয়া হালার-পো-হালা ইবলিশের বাচ্চা দুই বাবাজী মায় মামাবাবুকে তিনি হা-ই সাত দরিয়ার পারে জাহান্নামের চৌমাথায় পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।'[৫০]

খ. 'উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছি, কম-সে-কম শতকরা প্রায় দশ পনরটা শব্দ পাকড়াও করা সম্ভব। প্রবন্ধগুলা ঠারে-ঠোরে বুঝাও যাইতেছে মন্দ নয়। রগড় বটে। ইতালিআন ভাষার কোনো ব্যাকরণ, প্রথম পাঠ বা অভিধান আজ পর্যন্ত হাতে নাড়াচাড়া করি নাই। একমাত্র ফরাসির জোরে ইতালিআন লেখাগুলা কষ্টেসৃষ্টে সম্‌ঝিয়া লইতেছি। তবে একে 'বুঝা' বলে না। মনে হইতেছে যে, বেশ কিছু খাটা দরকার হইবে। ইতালি দেশ যে সকল নরনারীরই একটা 'দেখিতব্য' মুল্লুক—ইহাই হইতেছে পত্রিকার ভাবার্থ।' (বিনয়কুমার সরকার, বর্তমান জগৎ)[৫১]

এঁদের সচেতন সম্মার্জনী সঞ্চালনে ভাষা থেকে জাতের ছুঁৎমাগ বিদূরিত এবং মহাসমারোহে গুরুচণ্ডালী সমমর্যাদায় অভিষিক্ত। অকৃত্রিম কথ্যভাষার অন্বেষণে এ যুগের লেখকরা মৌখিক ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত নিরাভরণ নিত্যদিনের ভাষাও যে কতো চিত্তাকর্ষক ও মধুবর্ষী হতে পারে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাংশে তার নিদর্শন :

> অজীর্ণ জীর্ণ মনিব খুব উত্তেজনাপূর্ণ আওয়াজে বলতে বলতে এসে ঢুকলো, "বুঝলে, পশ্চিমের জলহাওয়ায় শরীরটা বেশ বাগিয়ে, মনটা তাজা করে নিতে হবে। স্টমাক বেশ প্যাক্ করে খাওয়া চাই। এখন সেরেফ্ আনন্দ আর আহার। মেসের মুখে মারো ঝাড়ু। সেই ওলমুখো দেদো দামোদর ঠাকুর বেটার শ্রীবদন কিছুদিন যে আর দর্শন করতে হবে না—এইটাই পরম শান্তি। বেটা নাগাড়ে নটে শাগের কাঁড়ি গিলিয়ে নাড়ী বরবাদ্ করে দিয়েছে! এখন দেখে নিও—খিদেও যেমন চন্‌চন্ করে বাড়চে, রক্তে তেমন সন্‌সন্ বেগ ধরচে। কি বল? (পদাঙ্ক, পৃ. ২৩৬-৩৭)

প্রচলিত উর্দু-হিন্দী-ফার্সী-সংস্কৃত-ইংরেজীর সঙ্গে নিতান্তই ঘরোয়া শব্দের ঘেঁষাঘেঁষিতে পণ্ডিতারোপিত গুরুচণ্ডালীর ফতোয়া ফুৎকারে

বিলীন! এমন জীবননিষ্ঠ ভাষার কলকাকলী প্রমথ চৌধুরীর রচনায় অবিশ্বাস্য—যদিও আঞ্চলিক তথা মৌখিক ভাষার ঢলে 'সবুজপত্র' তখন বেসামাল। এমনকি আদ্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় প্রণীত রচনা মুদ্রণেও তার দ্বিধা নেই। ঢাকার মাণিকগঞ্জের কথ্যভাষায় প্রকাশিত 'হৈরা' গল্পের ভাষার নমুনা :

> গয়ানাথের হুকুম মতে হৈরা ভোর বিয়ানে উইঠা চৈতালি ফসল বুইঝ্যা আইন্‌ব্যার জন্যে বরগাদারের বাড়ী যাইব্যার লাইগ্‌ছিল—এমুন সুমে পথে মরা কান্দন শুইনা তার পাচ পরাণ ছ্যাৎ কইর‍্যা উঠল। বরগাদারের বাড়ী আর যাওয়ন হৈল না, সে তাড়াতাড়ি গোসাই বাড়ীর দিগে ছুইটা গেল।
>
> ...রাধিকা গোশাইর মাঝারো ছাওয়ালটীর উপ্‌রে পোশ্‌ রাইতের থিকা ওলা দ্যাব্‌তার নজর হওনের কথা সে আগেই শুন্‌ছিল কিন্তু কোন ছুতায়ই গয়ানাথের কামকাজ এরায়্যা একবার আইসা খোঁজটাও নিবার পারে নাই, তার দুই চইখ্‌ বাইয়্যা দরদরয়্যা জল পইর্‌ব্যার লাইগ্‌ল।[৫২]

এ দৃষ্টান্তে ভাষায় নোতুনত্বের জোয়ারের প্রাবল্য অনুমেয়। শোভন কথ্যরীতির কাব্যগুণান্বিত শ্রুতিমধুর পেলব রূপের রূপকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)।

বাংলা গদ্যের সংস্করণ ও নবরূপায়ণে প্রমথ চোধুরী রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি সমর্থন পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বাংলার রূপ সম্বন্ধে তাঁর বিধানই বাংলা গদ্য সংক্রান্ত বিতর্ক ও অনিশ্চয়তার যবনিকা ঘটিয়েছে, বলা বাহুল্য নয়। বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত রবীন্দ্রনাথ অহেতুক আভিজাত্যের সিন্দাবাদের ভার বহন করেন নি। ফলে প্রাকৃত ও 'যাবনিক' শব্দের বিপুল সমারোহ তাঁর সৃষ্টিসমুদ্রে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার কিশোর বয়সের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) 'হুতোমের' পর বাংলা কথা ভাষায় দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। কবিগুরুর প্রথম গদ্য গ্রন্থটিই অনাগত দিনের পরিশ্রুত বাংলা গদ্য-রূপের স্থায়ী কাঠামোটি বক্ষে ধারণ করেছে। লালিত্যময় ভাষায় বক্তব্য স্বচ্ছতর।—

ক. 'একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সুমুখে দেখো, তাঁকে দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব।··· কথা ক'ন আর না ক'ন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তিনিই একজন মহা তেরিয়া-মেজাজের লোক।'[৫৩]

খ. 'গর্মি কাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপুর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুর বেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইছে, রোদ্‌দুরে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।'[৫৪]

অতঃপর গদ্যে সাধুরীতির কাঠামো অবলম্বন করলেও 'সবুজপত্রে'র আত্মপ্রকাশের পর তিনি আর চলিত রূপকে পরিহার করেননি। পূর্বেই বুঝেছিলেন সাধু-চলতির বিভেদের অবসান আসন্ন। লিখেছেন,— 'বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে,—একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।'[৫৫] জীবনের উপান্তে এসে সর্ব দ্বিধামুক্ত গুরুদেব নিঃশঙ্ক আত্মপ্রত্যয়ে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক প্রবাহের জয়ধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালী অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।'[৫৬] সর্বজনমান্য ভাষারীতি প্রসঙ্গে লিখেছেন,—'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।'[৫৭] সঠিক কারণটিও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। চলমান চলিত ভাষার আড়ষ্টতা লাভের ফুর্সৎ নেই। এবং সর্বদা সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজীব ও পুষ্ট করে চলেছে। কাজেই তার বিনষ্টির আশঙ্কা অমূলক। —"সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করেনা চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী

হাল্কা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট পাওয়া শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোষাক প'রে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও-ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালীর শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চাপাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।"[৫৮]

বর্তমানে সাধুভাষার অস্তিত্ব কিছু পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ। কালের অমোঘতায় এর বিলুপ্তি অনিবার্য হলেও "তথাকথিত 'সাধু' ভাষা যখন আর থাকবে না, তখনও দুটো ভাষা থাকবে; একটি সাধু, আর-একটা কম সাধু; একটা গম্ভীর, সুস্থির, সংস্কৃতবহুল, অন্যটা হাল্কা, ইডিয়মপ্রধান, দ্রুত পরিবর্তনশীল মুখের কথার সঙ্গে তাল রাখতে চঞ্চল। ক্রিয়াপদ-গুলো এক হ'লেও এ দু'য়ের জাতের তফাৎ আমরা সহজেই চিনতে পারবো—এখনই পারছি, রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' আর সৈয়দ মুজতবা আলির 'চাচা-কাহিনী' তো আইনত একই রকম বাংলায় লেখা, কিন্তু কে না জানে ও-দুয়ের মধ্যে দূরত্ব কত দূরতিক্রম্য।···বাংলায় 'চলতি' ভাষাও তো আসলে একটা ভাষা নয়, তার মধ্যেও অনেক স্তরভেদ আছে, কিন্তু প্রাচীন ক্রিয়াপদ নিয়ে একটা প্রতিযোগী 'সাধু' ভাষা এখনো দাঁড়িয়ে আছে ব'লে তার প্রতিতুলনায় সেই বিভিন্ন স্তরগুলোকে অভিন্ন ক'রে দেখবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়।"[৫৯]—এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের প্রবল দুটো ধারা—সাধু ও চলতি। চলতি বা কথ্যভাষা আবার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে একটি খাতে হুতোম-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিবেকানন্দ ও তাঁদের অনুসারীদের চলার পথ নির্দেশিত, অপর সরণিতে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ-অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের অনুগামীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দ

পদচারণা। উভয় সরণির সঙ্গমস্থলে পরবর্তী মাইল-স্টোন সৈয়দ মুজতবা আলী॥

বাংলা লেখ্য ভাষা

সাধু | চলিত বা চলতি

হুতোম-দ্বিজেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ ও তাঁদের অনুসারী | রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ-অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের অনুগামী

সৈয়দ মুজতবা আলী

০৩.

আপন সৃষ্টির মধ্যে নিরূপিত লেখক-সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই তাঁর স্টাইল। এবং রচনাশৈলীর মধ্যেই মুজতবা আলীর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব বর্তমান। বাক্-প্রতিমায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টিই তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর। "মুজতবা আলী প্রসঙ্গে এ কথা···নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর স্বভাব, মানসিকতা, চিত্তগত প্রবণতা তাঁর শব্দের সম্ভারের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।··· বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি।"[৬০] সাবলীল বাগভঙ্গিমা ও বিচিত্র শব্দ- ভুবনের দৌলতে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অবিসংবাদিত। লেখকের সাফল্য সম্পর্কে স্বয়ং মুজতবার ভাষ্য: "অভিনয়-দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকর 'সকলং হস্ততলং'—লেখা তখনই হয় Convincing ; তার বিগলিতার্থ অভিনয় করার সময় যেরকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। ...কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা—কেউবা স্ল্যাঙ্ ব্যবহার করে,

কারো বা ইডিয়ম জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বলে ভশ্চাযের মত সংস্কৃতঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক—এ সবকটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা Convincing ধরনে প্রকাশ কয়া যায় না।" আর "ভাষা করায়ত্ত থাকলে ছাতীকেও বাংলা বলানো যায়!"[৬১] এবং মুজতবা আলী সর্বদা এই Convincing গদ্যেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ফলে সার্থকতা এসেছে অনিবার্যভাবে। চরিত্র ও বিষয়ানুযায়ী তাঁর ভাষা ও বর্ণন বৈচিত্র্যের সম্ভার। বিশেষ কোন গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না বলেই তাঁর সৃষ্টির স্বাদুতা যেমন তারল্যে পান্‌সে হয়নি, তেমনি নবীনতায়ও মালিন্যের আস্তরণ নির্লক্ষ্য। আমরা পাঠকের দৃষ্টিতেই তাঁর ভাষা ও শৈলীর মূল্যায়ন প্রয়াসী। কেননা "সাহিত্য সর্বকালের সর্বজনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক পাঠক স্বয়ং।"[৬২] সমকালীন দু'জন প্রবীন সমালোচক ও সাহিত্যিকের ভাষ্যেও মুজতবার Convincing রচনাশৈলী সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিধন্য। ১৯৫২ সনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'তিনি [মুজতবা আলী] যা ভাবেন তা পুরোপুরি পাঠককে দিতে পারেন। ঠিক এই মুহূর্তে মুজতবা সাহেব বোধকরি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।...একটা-কোন কথার সূত্র ধরিয়ে দিলেই হল...শুরু হল অনায়াস বাক্যস্রোত। কথাশিল্পী একেই বলে—আলী সাহেবের কথা অমৃত সমান বললে অত্যুক্তি হয় না। ...নিছক গল্পই হোক আর অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর আলোচনাই হোক, কথা বলার এমন জীবন্ত ভঙ্গী, পড়তে পড়তে লেখকের কণ্ঠস্বর যেন কানে ভেসে আসে। এমনকি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বক্তার ভ্রূ-ভঙ্গি এবং হাত-নাড়ার আভাস পাওয়া যায়।"[৬৩] সমালোচক মুজতবা-সুহৃদ এবং তাঁর আড্ডার দোসর। সুতরাং, রচনা ও বাক্‌ভঙ্গিমার সহজাত সাদৃশ্য নির্দেশ তাঁর পক্ষে সহজতর। একই সুরের প্রতিধ্বনি বিমল মিত্রের কণ্ঠেও। ১৩৮১-তে লিখছেন, "আলি-সাহেবকে কখনও আড্ডায় দেখতে পাইনি কিন্তু তাঁর লেখা দেখি, লেখা পড়ি। পড়ে মনে হয় সশরীরে আড্ডা না দিলেও কলমে তাঁর বৈঠকী-আড্ডার আমেজ পাচ্ছি, তাতেই পুষিয়ে যায় তাঁর অনুপস্থিতি।"[৬৪]

আদর্শ সাহিত্য সম্বন্ধে মুজতবা আলীর ধ্যান-ধারণার পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে রয়েছে। ফার্সী এবং ফরাসী—দু'টো সাহিত্যই তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ফার্সী আলঙ্কারিকের বক্তব্য, "আদর্শ

সাহিত্য রস তখনই সৃষ্ট হয় যখন লেখক সনাক্ত করতে পারেন... রচনার সীমা...কোথায়।'—শনাখ্‌তন-ই-হদ্দ-ই হর্ চীজ...।"[৬৫] আর "ফরাসী অলঙ্কারিকের মুখে সদাই এক বুলি: 'ক্লার্‌তো, ক্লার্‌তে—তুজুর লা ক্লার্‌তে।'...ফরাসী গুণীর আদর্শ 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা—অল্‌ওয়েজ স্বচ্ছতা।"[৬৬]—এই ইষ্টমন্ত্র রূপায়ণে মুজতবা ছিলেন সদাসচেষ্ট। ফলে তাঁর ভাষা সোজাসুজি ওষ্ঠের আশ্রয় ছেড়ে কলমের মুখে মুক্তি পেয়েছে। এজন্যেই মুজতবা সাহিত্যে হরেকরকম ভাষা ও বুলির ছড়াছড়ি। অবশ্য তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে কখনো অবহেলা করেননি। চটুল-চঞ্চল চলতি ভাষায়ও প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দসম্পদ ব্যবহার করে ভাষাকে দিয়েছেন দার্ঢ্য ও প্রসাদগুণ। সাহিত্য জীবনের প্রদোষ লগ্নেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন,—'ভাষা বহু তিলিসমাৎ, বহু মিরাকল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।'[৬৭] ভাষার এই ঐন্দ্রজালিক শক্তির অত্যুত্তম নিদর্শন মুজতবা-রচনাবলী। ভাষাকে স্বচ্ছতর ও সর্বপ্রকাশক্ষম করার নিরলস সাধনায় মগ্ন থেকেও তাঁর সশঙ্ক জিজ্ঞাসা:

> আমার সস সময়—লেখার কথা বলছি—ভয়, যথেষ্ট সরল করে বলতে পেরেছি কি?
>
> আমার লেখার সবচেয়ে বড় দোষ—বিস্তর parenthesis, ব্রাকেট দিয়ে সংশ্লিষ্ট কথা বলা, ফুট নোট, লম্বা dash ইত্যাদি। সোজাসুজি হ্রস্ব হোক, দীর্ঘ হোক, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে যে আর পাঁচটা reference মনে পড়েছে সেগুলো অকাতরে বিসর্জন দিয়ে, মোদ্দা কথাটা বলে যাওয়া। Perfect logical thinking power থাকলে এসব 'বাস্তর' 'অবান্তর' সব কিছুই মূল বক্তব্যের সঙ্গে weave in করা যায়। লম্বা ডেশ, ব্রাকেট, ফুট নোট, গৎ দ্বারা রচনা কন্টকিত না করে।[৬৮]

—রোজনামচায় লিখিত বক্তব্যটি সুশৃঙ্খলিত না হলেও লেখকের অনুভূতি স্বচ্ছ। পূর্বেও উল্লিখিত, মুজতবার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন শিক্ষক সর্বদা জাগ্রত এবং যে-কোন বক্তব্যের সূত্রে তিনি অলক্ষ্যে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায়তা করেছেন। আশকথা-পাশকথা মূল বক্তব্যে অপূর্ব নৈপুণ্য বুনে দেয়ার সামর্থ্য ছিলো বলেই অলঙ্কার তথা পাণ্ডিত্য ভার হয়ে ওঠেনি। এবং সর্বত্র তাঁর ভূমিকা কথকের।

গুরুত্বপূর্ণ ভাবগম্ভীর বিষয়ও লেখকের অনুপম বাক্‌স্রোতে লীলায়িত ভঙ্গিতে সপ্রকাশ। 'খোস গল্প যে একটা আর্ট এ সত্য একালে আলী সাহেবই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'[৬৯] সরস বৈদগ্ধ্য এবং চটুল তারল্যের সঙ্গে গভীর জীবনবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণে অনন্য সৃষ্টি মুজতবা সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ তার ভাষা। বিষয়ভেদে ভাষার সুর বদল যেমন স্বাদু, তেমনি শ্রুতিসুখকর। এমন মোহনীয় ভাষার কারুকার বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ডক্‌টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপলব্ধি :

> প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সত্যকার হাস্যরসোজ্জ্বল, লঘু শৈলীর অথচ ভাবগম্ভীর চল্‌তি বাঙ্‌লা ভাষায় তিনি [মুজতবা আলী] যে অসাধারণ দখল তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন, সেটী তাঁর মনের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রসাদ উভয়ের গঙ্গাযমুনা-মিলনের ফল।
>
> ···চল্‌তি বাঙ্‌লা যে কত জোরদার ভাষা, তা ইনি নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বা ঢঙ্গে নোতুন ক'রে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই রকমভাষা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, তাতে আর সন্দেহ নেই। অন্তর্নিহিত শক্তিকে টেনে বার করাই মুন্‌শিয়ানা—ডাক্তার মুজতবা আলী সে মুন্‌শিয়ানার অধিকারী। সহজাত কবচের মত সুন্দর শক্তিশালী ভাষার বর্ম তাঁর লেখার ভাবদেহকে ঘাতসহ ক'রে রেখেছে।[৭০]

প্রথম গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে মুজতবা আলীর পদচারণার যে শুভ সূচনা—পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী ও চাচা-কাহিনীর প্রকাশনায় তা' সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং তখন তিনি জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। তার সগর্ব স্বীকৃতি অগ্রজপ্রতিম—মুজতবার বিবেচনায় শান্তি নিকেতনের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক—৺প্রমথনাথবিশীর লেখনীতে।—

> সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ভাষায় মজলিশি সাহিত্যের বাদশা। গল্প বলতে গিয়ে, প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, কথা কইতে গিয়ে আসর জমানো মানে কিনা নিজের ব্যক্তিত্বের ঢিলে আল-খাল্লাটা পাঠকের গায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কঠিন কাজে

তাঁর জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। এই অভিনবত্বের রসটি নিয়ে প্রথম যখন তিনি দেখা দিলেন দেশে বিদেশের কাহিনী হাতে, ক্ষণকালের জন্য বাঙালী-পাঠক, বিস্ময়ে নিস্তব্ধ থেকে তারপরেই তাঁর জয়ধ্বনি করে উঠেছিল।[৭১]

ভাষা এবং ভঙ্গী—এ'দুটো বলিষ্ঠ উপকরণের উপস্থিতির ফলে মুজতবার সৃষ্টি কালোত্তীর্ণতার দাবী রাখে। গুরুচণ্ডালীর ছুঁৎমার্গ রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন। আর মুজতবা আলীর রচনায় তারা গাঁটছড়া বেঁধে বসেছে। নবকলেবরে তথাকথিত গুরুচণ্ডালী তাঁর লেখায় গুণাকর বিশেষ। "তৎসম, তদ্ভব, আরবী, ফার্সী, এমনকি ফরাসী ও জার্মানি শব্দের মুখরোচক এবং সর্বপ্রথম, হয়তো সর্বশেষও, সার্থক পাঁচমিশুলী সম্ভব হয়েছিল মুজতবা আলীর অজস্র প্রতিভার দৌলতে। আশ্চর্য এই সংমিশ্রণ, কারণ কোথাও এতটুকু ছন্দপতন নেই, সবটুকু নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রুতিসহ।"[৭২] বাংলাগদ্যে আরবী-ফার্সী তথা বিদেশী শব্দ প্রয়োগের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। কিন্তু মুজতবার মতো এমন সতেজ সঙ্কোচহীন শব্দব্যবহার অন্যত্র অদৃষ্ট। "টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ এসেছে পুষ্পবৃষ্টির মত। নজরুল ইসলামের ভাষায় কালবৈশাখীর মত।" আর মুজতবা আলীর লেখায় "নিত্যকার সঙ্গীর মত।"[৭৩] তাই তাঁর ব্যবহৃত বিদেশী শব্দাবলীকে এক মুহূর্তের তরেও অপরিচিত-অনাত্মীয় বলে ভ্রম হয় না। সর্বোপরি হিউমারের আবরণে সেগুলোর আবেদনও পাঠক-হৃদয়ে প্রত্যক্ষ এবং এখানেই আলী সাহেবের অনন্যতা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য: 'বাঙলা কবিতায় আরবী -ফার্সী শব্দের যথাযথ ব্যবহার করে এবং ভাবের উদ্দামতায় কাজী নজরুল যেমন নোতুন দিক্ নির্দেশ করেছেন, তেমনি বাংলা গদ্যে মজলিসী রীতির পথ নির্দেশ করে, নোতুন শব্দাবলী ব্যবহার করে মুজতবা নোতুন গদ্য শৈলী সৃষ্টি করেছেন—যা আমি পারিনি।... নোতুন পথ-নির্দেশক হিসেবে মুজতবাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক।"[৭৪] তাঁর অবলম্বিত গুরুচণ্ডালীতে শুধুমাত্র সাধু-অসাধু নয়, 'যাবনিক' শব্দের সঙ্গে একই পংক্তিতে সংস্কৃত-জার্মান-ফরাসী-ইংরেজী-রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বাঙাল শব্দ অতি অবলীলায় আপন আপন স্থান বেছে নিয়েছে। সুতরাং, মুজতবা শুধুমাত্র 'যাবনিক' শব্দ নয়,

প্রয়োজনে যে-কোন ভাষার শব্দ আমদানী করেছেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমথ চৌধুরীর যোগ্য উত্তরাধিকারী। শব্দব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে বার্ধক্যে তিনি লিখেছেন: 'এক দল অর্ধ-উন্নাসিক পাঠক আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন বহু বৎসর ধরে। কেন, বলতে পারবো না। কখনো ভেবেছি, অনুকম্পা বশতঃ ···কখনো ভেবেছি, হয়তো আমার "মুসলমানী" চিন্তাধারা, ভাষার যাবনিক কায়দা-কেতা" তার নূতনত্বের জন্য কোনো কোনো একঘেয়েমি-ক্লান্ত পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। আমি অবশ্য সে-সম্বন্ধে অল্পই সচেতন ছিলুম; আমি জ্ঞানত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করিনি যা সুদ্ধমাত্র যাবনিকতা দ্বারা 'নিত্যনবীনের' সন্ধানী জনের পাঁজরে কাতুকুতু দিয়েছে, জড় রসনায় চুলবুল জাগাবার চেষ্টা করেছে। যাবনিক জিনিস আমি আলিঙ্গন করেছি, পাঠকের সম্মুখে পেশ করেছি তখনই, যখন অনুভব করেছি সে যাবনিকতার মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব সঞ্চারিত আছে, যে যাবনিকতা দেশকালপাত্র উত্তীর্ণ হয়ে শাশ্বত হবার অধিকার লাভ করেছে। ···বলা বাহুল্য খৃষ্টীয়, অখৃষ্টীয়, জনপদসুলভ ভাবধারা, আমার আবাল্য পরিচয়ের খাসিয়া সাঁওতাল সভ্যতার প্যাটার্ন আমি ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি যে ভাবে আমি যাবনিক চিন্তা-মণিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি।'[৭৫] মুজতবার রচনাবলীই তাঁর বক্তব্যের অকৃত্রিমতার বিশ্বস্ততম স্বাক্ষর। তিনি প্রাণবান সজীব ভাষা চেয়েছেন, মানুষের কণ্ঠ যে ভাষার আশ্রয়। এ-ভাষা বর্জন করার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই, বরঞ্চ পরিশ্রুত ব্যবহারে তা' আরো শোভন, শ্রুতিশোভন হতে পারে। এ-তত্ত্বটাই মুজতবা বোঝাতে চেয়েছেন শহর্-ইয়ারের স্বামী ডাক্তার জুলফিকার আলী খানকে। খানের 'ডাইলিয়ুটেড' হুতোমী ভাষা শুনে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের অকারণ কৌতুক প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন: "বাঙ্‌লা ভাষা কী তাড়াতাড়ি তার ভোল বদলেছে! ভারতচন্দ্র এমনকি আলাল হুতোম দু'জনাই আপনার [ডাক্তার খানের] চেয়ে বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বেনামী লেখাতে বিদ্যেসাগর মশাই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন হুতোমের চেয়ে কম।··· আজ যদি প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বিদ্যেসাগর কলকাতায় নেমে আড্ডা জমান তবে তাই শুনে বোধ হয় আপনার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা ভিরমি খাবেন। কাজেই আমার পরামর্শ যদি নেন তবে বলবো, আপনার ভাষা বদলাবেন না। কেউ যদি মুখ টিপে হাসে, হাসুক। আমার অঞ্চলের

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও অত্যন্ত সংস্কৃতঘন বাঙলা বলেন—'হপ্তা দুত্তিন' না বলে বলেন 'পক্ষাধিককাল' এবং তাই শুনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই কৌতুক অনুভব করে। তাতে কি যায় আসে ?"[৭৬] আলী সাহেব মুখের স্বাভাবিক বুলিকে অচ্ছুত করে রাখেননি। স্বচ্ছতা, বিস্তৃতি ও গভীরতার মধ্যেও তাঁর রচনার চালটি লঘু এবং আনাতোল ফ্রাঁসের আপ্ত বাণী—'তুমি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমণ করতে করতে পেরিয়ে যেতে চাও তবে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো'—তিনি মনে প্রাণে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচনা কখনো পাঠকের শিরঃপীড়ার কারণ হবে না। লিখেছেন—"আমার রচনা হবে যুগ মানানসই হেলিকপ্টার,—অনেক নিচু দিয়ে যায় বলে, অনেক মন্থরে চলে বলে পাঠক হয়তো অনেক আধ চেনা জিনিসের চৌদ্দ আনা চিনে নেবে।"[৭৭] ভাষা শৈলীর প্রশ্নে ঘুরেফিরে আলী সাহেব ফরাসী রীতির পানেই বারংবার দৃক্‌পাত করেন—"স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, অল্‌ওয়েজ স্বচ্ছতা"। এজন্যেই শব্দচয়নে তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত। ভাষা ভাব প্রকাশের জন্যেই, কিংবা বলা যায় ভাবের সচেতন বাঙময় অনুভূতিই ভাষা। সুতরাং এ-অনুভূতির নিরঙ্কুশ প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন সর্বোত্তম ভাষা। আর ভাষার নিটোল সুষম নির্মিতির জন্যে চাই শ্রেষ্ঠতম শব্দসম্ভার। এ-প্রয়োজনেই শিল্পী মুজতবা দেশী-বিদেশী, সাধু-চলিত, গ্রামীণ-শহুরে সর্ববিধ ভাষা থেকে সঠিক শব্দটি নিপুণ জহুরীর মতো চয়ন করেছেন। "ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে সেখান থেকে যাই-ই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী।"[৭৮] স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর সঙ্গে জীবন্ত ভাষা তুলনীয়। স্তব্ধগতি জলধারা যেমন ডোবার নামান্তর, নির্জীব ভাষাও তদ্বৎ। ভাষাকে প্রাণবন্ত, চলিষ্ণু রাখার গুরুদায়িত্ব সাহিত্য-শিল্পীর। "সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল।...প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার নূতন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়।"[৭৯] ভাষার চারু রূপনির্মাণ ও পাঠকের চিত্তবিনোদনের অবকাশে তাঁকে কিছুটা সমৃদ্ধ করে তোলা ছিলো মুজতবার অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে ভাষার খেলায় তাঁকে নামতে হয়েছে এবং নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার শব্দই

ব্যবহার করেছেন হাতিয়ার হিসেবে। এ বিষয়েও তাঁর মানসিক প্রস্তুতি ছিলো কৈশোর কাল থেকেই ॥

০৪.

জনৈক উন্নাসিকের প্রশ্নোত্তরে মহারাষ্ট্রের সাধক তুকারাম বলেছিলেন, 'সংস্কৃত যদি সাধুভাষা হয়, মারাঠি কি তবে চোরের ভাষা?' এ-সূত্রে মুজতবা আলীর সংযোজন, "অতএব প্রথমেই মনঃস্থির করিয়া নেওয়া উচিত যে, চলিত বা চলতি ভাষা অসাধু নহে।"[৮০] আমরা অধ্যায়টির প্রারম্ভে 'সাধু বনাম চলিত' পাঁচালীর মোটামুটি একটা বয়ান দিয়েছি। শিল্পীর হাতে ভাষা কখনো জাত হারায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর স্বপক্ষে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। "রবীন্দ্রনাথ যে রকম 'কবি তাঁহার কল্পনা উৎসের যত করুণা বারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন' লিখতেন ঠিক তেমনি 'শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'ও লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে রকম 'লীলাচঞ্চলা রঙ্গ-নিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি' লিখতেন ঠিক সে-রকমই 'ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকী'ও লিখতেন। অর্থাৎ ভাষার হাটে ভশ্চায থেকে আরম্ভ করে মৌলোবীর সঙ্গেও এদের লেনদেন ছিল।"[৮১] ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে মোল্লা-পুরুত-পাদ্রী-রাব্বি—প্রত্যেকের সঙ্গেই ডক্টর আলীর ছিলো অবাধ দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। জাত বিচারের ফুর্সৎও ছিলোনা। বাক্‌প্রবাহিত শব্দাবলী অবলীলায় তাঁর লেখনী ধারণ করেছে। শুধু ইতর অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেননি। শান্তিনিকেতনের নির্মল পরিবেশ এবং 'গুরুদেব' ও তাঁর সর্বাগ্রজ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব কিশোর হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতেছিলো। তাঁদের নির্দেশিত পথ ও পাথেয় মুজতবার সাহিত্য জীবনের অক্ষয় সঞ্চয়। সর্ব সংস্কারমুক্ত 'বড়বাবু' দ্বিজেন্দ্রনাথই মুজতবাকে হুকুম দিয়েছিলেন, গুরুচণ্ডালী 'আলবত মানবে না'। প্রচুর যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, "বাঙলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে এর দ্বারা সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন। তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে: টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটিও কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরই একটি জুৎসই—most juste—সহজ বাঙলা শব্দ আসে তবে সেটা নির্ভয়ে ব্যবহার

করবে। ভাষার লালিত্যের তরে তুমি এমন কোনো শব্দ গ্রহণ করবে না, যার ফলে তোমার চিন্তার সামান্যতম শেড্, ক্ষুদ্রাতপি nuance বিসর্জন দিতে হয়।"[৮২] ভাষারীতি প্রসঙ্গে 'রবি-মোহন-এন্‌ড্রুজ'-এর পাদ-টীকায় মুজতবার স্বীকৃতি—'অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে...।'[৮৩] পূর্বসূরিও দু'-চারজন দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের অমিত শক্তি ও মনীষা নিয়ে। মুজতবার প্রায় সমকালেই আবির্ভূত রাজশেখর বসুও ভাষার 'তিলিসমাৎ' দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়োৎপাদন করেছিলেন। মুজতবা লিখছেন: "'পরশুরাম' প্রয়োজন মত কখনো সংস্কৃত ঘেঁষা কখনো ফারসী ঘেঁষা বাংলা লিখে যে অপূর্ব রস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, সে রস বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমরা বাংলা লিখতে এখন আর এ বিচার করিনে, কোন্ শব্দ আসলে ফারসী আর কোন শব্দ সংস্কৃত।"[৮৪] প্রকৃতপক্ষে অকৃত্রিম মুখের লাবণ্যময় ভাষাই ছিলো মুজতবার অভীষ্ট, যে ভাষায় ভাবপ্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করতেন। এঁদের তিনি গুরুর সম্মান দিয়েছেন। সর্বোপরি রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার মুজতবার রচনায় বিস্তরে বিস্তর। দু'টি পত্রে বিদ্যাসাগরের প্রতি মুজতবার সশ্রদ্ধ প্রণতি ও তাঁর লেখায় বিদ্যাসাগরের প্রভাবের অকপট স্বীকৃতি—প্রথমটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখছেন—"যে-বিদ্যেসাগর তার অগাধ অকূল (দাদা, অপরাধ নিস্‌নি—'আমি যে কত অসংখ্যবার লোকটার লেখা আগা-পাস্তলা পড়েছি, তার গদ্য পাতার পর পাতা ঝাড়ানাগাড়ে কণ্ঠস্থ করেছি, গড়গড় করে এই বার্ধক্যেও সেই গদ্য, মশাই গদ্য, পদ্য নয়—আউড়ে যেতে পারি তা আপনি জানবে কি [এমনি বাক্যরীতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহার করতেন।] করে? আমার চেয়ে ঐ ওস্তাদস্য ওস্তাদকে বেশী চেনে এমনতর গুমোর যে করে "তার পিতা নির্বংশ হোক"—এটাও ঈশ্বর ঝেড়েছিল মহেশ ন্যায়রত্নের মাথাঃ উপর তাকে "কপিরত্ন"···টাইটল দেওয়ার পর,···বিদ্যে শেষ কণাটুকু—হেন বিদ্যে নেই, মশাই, ন্যায় স্মৃতি, বেদান্ত-সাংখ্য-মীমাংসাদ্বয় এবং সর্বোপরি অলঙ্কার, যার বদৌলতে এ্যাসন খাসা বাঙ্‌লা লিখেছে আমার মুরশীদের মুরশীদ ঈশ্বরচন্দ্র—হেন বিদ্যে নেই, মশয়, যেটা ঐ বামনা গুলে খায়নি, আর নব্যন্যায় যে কী অদ্ভুত কায়দায় twist করে

মহেশাদির মাথায় ঝুনো নারকেল ফট-ফট করে ফাটাতো বিধবা বিবাহের পোলেমিক্‌সে সে বলে শেষ করা যায় না…'[৮৫]

অপর পত্রে ৺অলেন্দু সেনকে লিখেছিলেন :

> আপনি কি 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য'র লেখা পড়েছেন? তার প্রথম পাতাতেই আমি এই সব ফাজলামোর শব্দ পেয়েছি : ফাজিলচালাক, তাকৎ, মজাদার, তুআক্‌কা, বেয়াড়া ইয়ার, তুখোড় ইয়ার, উপদেশ দিয়া দুরস্ত করা, দিল-দরিয়া, গুলছার, বেহুদা, ফেসাৎ, ফয়তা (ফতোয়া অর্থে), মরছি, নেকনজর, কবুল দেয়া, নজির, দায়ী…
>
> 'অমুককে প্রথম লক্ষ্মীছাড়া ও বক্‌কেশ্বর ঠাওরাইয়াছিলাম : এক্ষণে দেখিতেছি ইনি একজন খুব তুখড় সিয়ান ছোকরা। তাঁর বেদড়া মন্ত্রী আছে, এটি তারই তেঁদড়ামি।' 'আহাম্মক, হদ্দমুদ্দ, আসমান জমিন ফরক, আনাড়ির চূড়ামণি বেঅকুফের শিরোমণি, নিখিরকিচ, আমি খোদ্‌ হাকিমি করিয়া তাহাকে সাজা দিব।'
>
> বুঝুন ঠ্যালা কারে কয়! এসব লেখাগুলোতে বিদ্যেসাগর আলগ লাগাম ঘোড়ার মত কি প্রেমসেই না খিস্তি করেছেন। আমি বীরসিংহ গ্রামকে তীর্থ বলে মানি।[৮৬]

—উল্লিখিত শব্দসমষ্টি এবং 'খিস্তি' 'কস্যচিতে'র পাতায় পাতায় বিদ্যমান। এবং এর প্রায় প্রতিটি শব্দের সন্ধান মুজতবার রচনায় সুলভ। সুতরাং সম্পূর্ণ নোতুন রীতির উদ্ভাবন নয়, মুজতবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছেন বলাটাই অধিকতর সমীচীন। 'গুরুচণ্ডালী'র সগর্ব উপস্থিতি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যে ঝলমল তাঁর ভাষা।

হিন্দু-মুসলমান চাষী-ভদ্র নির্বিশেষে গ্রাম-বাংলার বহু পরিবারে কিছু কিছু আরবী-ফার্সী শব্দ প্রচলিত ছিলো এবং আছে। এ সমস্ত শব্দ হুতোমী ঘরানার লেখকদের রচনায় স্থান পেয়ে ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ, বক্তব্য হয়েছে সুস্পষ্ট ও জোরালো এবং সৃষ্ট চরিত্র হয়েছে বাস্তব ও প্রাণবন্ত। "সৈয়দ মুজতবা আলী এ ধারাকেই পরিশীলিত,

সঙ্গীতময়, মাধুর্যমণ্ডিত করে তুললেন। প্রয়োজনবোধে আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী-ইংরেজী-ফরাসী-জার্মান শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্য বিষয়কে করেছেন প্রাঞ্জল, সরস ও সুস্পষ্ট। বাঙ্লা ভাষাকে দিয়েছেন গতি, বাস্তবতা ও ঔজ্জ্বল্য।"[৮৭] গুরুচণ্ডালে আর ফারাক রইলো না। স্বতন্ত্র বেবাসে সুসজ্জিত হয়ে একই গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধে মোল্লা-পুরুতের আরোপিত বিধিনিষেধ কুলোর হাওয়ায় মুল্লুক ছাড়া! আওরঙ্গজেবের দরবার থেকে বহিষ্কৃত কিংবা সুযোগ-সুবিধে বঞ্চিত গায়ক-গায়িকা ও অন্যান্য শিল্পীরা বাদশাহ্-আলমপানাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত নৃত্যকলার প্রতীক স্বরূপ একটি বাদ্যযন্ত্রকে প্রকাশ্যে গোরদানের ব্যবস্থা করলে দিল্লীশ্বর 'নাকি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "...গোর দাও, কবর খোঁড়ো, কিন্তু খোঁড়ো গভীরতম নিম্নস্তরের পাতালপুরী পর্যন্ত, যাতে করে সে আবার না গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যায়।"' এই ঘটনার স্মরণে জীবনের অন্তিমে মুজতবা আলীও সানন্দে বিধান দিলেন 'আমরা ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলি "গুরুচণ্ডালিকে গোর দাও গভীরতম গহ্বরে, চিরতরে।"'[৮৮] গুরুচণ্ডালীকে অস্বীকার কিংবা দেদার বিদেশী শব্দ ব্যবহার করলেও মুজতবা খাঁটি দেশী শব্দ ও প্রবচন-সমাসকে অনাদর করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, 'আপন ভাষারই দু'টো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায়, সে দিকে সচরাচর খেয়াল যায় না।' উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন 'হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাসা সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে', দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরো-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।" লেখকের আক্ষেপ, 'আজকালকার লেখকেরা এ রকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দেশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিক-দের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—।"[৮৯]

ভাষা ব্যবহারে কোন রকম গোঁড়ামিতে মুজতবা আলী আচ্ছন্ন নন। তিনি বিশ্বাস করেন, 'সাধু লিখ, চলতি লিখ, কোনও আপত্তি

নাই—কিন্তু সরস ভাষায় লিখিতে হইবে।' ভাষা যে-কোন রীতির শরণাপন্ন হতে পারে। শুধু তার সর্ববিষয়বস্তুর প্রকাশক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। "চলিত ভাষা যে রকম দীন-দুঃখীর বেদনা আনন্দ প্রকাশ করিবে, সেই অনুযায়ী প্রয়োজনানুরোধে গম্ভীর রুদ্ররসেরও অবতারণা করিবে। সাধু ভাষায় যে দার্ঢ্য, যে কাঠিন্য আছে, তাহাকেও চলিত ভাষায় সঞ্চারিত করিতে হইবে।"[৯০] এবং চলিত-পন্থীদের সাধুভাষার দার্ঢ্যগুণ গ্রহণ ও সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে প্রসাদগুণ সঞ্চয়ের জন্যেও উপদেশ দিয়েছেন। বলিষ্ঠ মনন, বুদ্ধির সতেজ প্রকাশে সমৃদ্ধবান বাংলা গদ্যের ইতিহাসে মুজতবা অনন্য পুরুষ। শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী মনে করেন:

> বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিন দিক্‌পালকে 'মাইলস্টোন' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁরা হলেন টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। বাংলা গদ্য যখন পণ্ডিতদের হাতে সংস্কৃত শৃঙ্খলে বন্দী, সেই বন্দীদশা থেকে ভাষার মুক্তি ঘটিয়ে তাকে জনতার কাতারে নিয়ে এলেন টেকচাঁদ ঠাকুর। মুখের কথা স্থান পেলো গ্রন্থে। যে ধারার সূত্রপাত টেকচাঁদের হাতে, তারই পরিশীলিত নাগরিক রূপকার হলেন প্রমথ চৌধুরী। মুখের কথায় প্রজ্ঞা ও বাগবৈদগ্ধ্য মিশ্রিত হয়ে ভাষা হলো সুললিত, জোরালো, অধিকতর প্রকাশক্ষম। এরপর সৈয়দদার আবির্ভাব। তিনি উল্লিখিত দু'জনের লেখার ধারাকে আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর করে দিলেন। মুখের ভাষায় শুধু বৈদগ্ধ্য নয়—তার সঙ্গে যুক্ত হলো কথকতার অসাধারণ ভঙ্গী, যুক্ত হলো আঞ্চলিক কিন্তু প্রচলিত শব্দাবলী, তার সঙ্গে এলে পরিহাসপ্রিয়তা, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা এবং সর্বোপরি একটা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।[৯১]

জনশ্রুতির প্রাবল্যে একটা ভ্রান্তি আমাদের হৃদয়ে সমূল প্রোথিত। মুজতবা আলীর ভাষা-শৈলী বলতে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে আরবী-ফার্সী শব্দবহুল দোভাষী পুঁথির নাগরিক গদ্য সংস্করণের একটা প্রতিভাস আসে। মুজতবার মূল্যায়নে এটাই সর্বাধিক প্রামাণিক প্রমাদ।

প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভাষাকে 'শানিয়ে' তার ধার বাড়াতে চেয়েছেন। ফলে বিশেষ কোন রীতিতে কস্মিনকালেও আবদ্ধ ছিলেন না। এবং নিজেকে অতিক্রমণের একটা প্রত্যয়ী প্রচেষ্টায় তাঁকে দেখি সদা চঞ্চল। মুজতবা স্বয়ং তাঁর অবলম্বিত তিনটি ভাষা-রীতির উল্লেখ করেছেন---'গুরুগম্ভীর, হাস্যাত্মক এবং মেশানো।'[৭২] আরো নানাভাবে তাঁর ভাষাশৈলীর বিন্যাস করা যেতে পারে। তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সংবাদপত্রীয় নিবন্ধের ভাষার বিভিন্ন রূপ। বিষয় এবং চরিত্রানুযায়ী ভাষা নানাদিকে মোচড় খেয়েছে। কখনো সংস্কৃতঘেঁষা বিদ্যাসাগরী রীতি, আবার কখনো হুতোম-প্রমথ চৌধুরীর সম্মিলিত একটা মধ্যগা পন্থা---যাকে যথার্থ অর্থে 'সৈয়দী ঢঙ্' বলা যেতে পারে---অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে-পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, উইট-হিউমার, দরদ ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যে মুজতবা আলী অনতিবিলম্বে অনন্য মুজতবা হয়েই আত্মপ্রকাশ করেন। আমরা তাঁর রচনার আলোকেই মুজতবার অনুশীলিত 'স্টাইল' অনুধাবনের চেষ্টা করবো। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি, শরৎচন্দ্রের হাস্যরসিকতা প্রসঙ্গে মুজতবা লিখেছেন ---'আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্য ব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।'[৭৩] মুজতবা আলীর --- এবং যে-কোন সাহিত্যিকের---ভাষাশৈলীর মূল্যায়নে এটাই আমাদের বিবেচনায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

০৫.

ভাষা ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে মুজতবা আলীর অনুভূতির অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি তাঁর রচনাসম্ভার। তাঁর রচনাভঙ্গীর প্রধান লক্ষণীয় দিক বৈচিত্র্য। বিষয়বস্তুর মতো উপস্থাপনার পদ্ধতি ও ভাষা নির্মাণেও তিনি বৈচিত্র্যপিয়াসী। ফলে, দু'-একটি উদাহরণ-দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলী সাহেবের লেখার 'স্টাইল' সুচিহ্নিত করা সম্ভব নয়, অসমীচীনও বটে। তাঁর ভাষাশৈলীর তিনটি মুখ্য 'বিশুদ্ধ' ধারা---ক. সাধু, খ. চলিত ও গ. গুরুচণ্ডালী। পূর্বেই উল্লিখিত, শুধুমাত্র ক্রিয়াপদ ও সর্ব-নামের রূপভেদের উপর সাধু-চলিতের পার্থক্য নির্ভরশীল নয়। আমরাও স্বীকার করি। সে-সঙ্গে আরো স্বীকার্য, শব্দচয়ন ও ভাষা-ব্যবহারে প্রত্যেকেরই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য থাকতে বাধ্য। দেশ-কাল, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক-পারিপার্শ্বিক-পারিবারিক প্রতিবেশও শব্দ প্রয়োগ

ও ভাষাগঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং ব্যক্তিচেতনা, শিল্পানুভূতি ও সংবেদনশীলতার স্পর্শে সৃষ্টিশীল লেখকের ভাষা আপন বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। আর এ স্বরূপ থেকেই তাঁর স্টাইল তথা ব্যক্তি লেখককে সনাক্ত করা সম্ভব।

সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেও মুজতবা যেমন ভাষায় অবাধে আঞ্চলিক-আরবী-ফার্সী কিংবা ইংরেজী বা অন্য যে-কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি চলিত কাঠামোতেও করেছেন তৎসম শব্দের যথাবিহিত সুপ্রয়োগ। অর্থাৎ শব্দচয়নে গুরুচণ্ডালীকেই তিনি সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং প্রয়োজন, শ্রুতিমাধুর্য ও স্বচ্ছতাকে দিয়েছেন সর্বাধিক গুরুত্ব। একারণে একই রচনায় বিভিন্ন শৈলীর প্রকাশ হয়েছে অনিবার্য। ভাষা গঠনে মুজতবা যেমন জার্মান ভাষার অনুরূপ সুদীর্ঘ পদ ও বাক্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাঁর লেখায় ফরাসী কায়দায় ছোট ছোট পদ সংবলিত কোমল-মধুর বাক্যেরও প্রাচুর্য। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষা প্রায় অনুরূপ। ভ্রমণ কাহিনীতে সম্পূর্ণরূপে আড্ডার মেজাজ বর্তমান এবং এদিক থেকে লঘু নিবন্ধগুলো এরই সমগোত্রীয়। সংবাদপত্রীয় নিবন্ধে আবার ভিন্ন সুর, ভাষা ও বাচনভঙ্গীতেও পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে মূলের রস অক্ষুণ্ণ। সৃজনীপ্রতিভা ও ভাষার ওপর অসাধারণ দখলের ফলেই তা' সম্ভব। আর বিষয়বস্তু অনুসারে রচনা কখনো হাস্যমুখর, কখনো অশ্রুসজল, আবার কখনোবা লঘু-গুরুতে সুরের ওঠানামা। শুধুমাত্র বিষয় বা কালের নিরিখে মুজতবার রচনা-শৈলীর মূল্যায়ন যথেষ্ট যুক্তিবহ নয়। কেননা একই কালে অভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষারীতির আশ্রয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্টাইলের ধারাবাহিকতা নির্দেশে আমরা কাল ও বিষয়বস্তু—উভয়েরই শরণ নেবো।

মুজতবা আলীর সন্ধানপ্রাপ্ত প্রথম রচনা 'নেড়ে', বিশ্বভারতীর দেয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বহু পরে পুস্তকে সংকলিত। মূল লেখাটি দেখা সম্ভব হয়নি বলে প্রথম প্রকাশ ও সংকলিত রচনাটির মধ্যে ভাষার তারতম্য কিংবা শব্দচয়নের ক্ষেত্রে রকমফের সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। মুজতবার লেখা প্রাচীনতম যে

গদ্য নিদর্শন আমাদের হতে রয়েছে—তা' ব্যক্তিগত পত্র এবং বন্ধুর উদ্দেশে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা, ১৯২১ সালে। সাদামাটা ভাষায় ঘরোয়া চিঠি।—

> তোমার দীর্ঘ পত্রখানা পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারিব না। কেননা এখনই ফরাসী ক্লাশ আরম্ভ হইবে কাজেই তার আগে একটু পড়াশুনা করিতে হইবে।…যাহাই হউক হলফ করিয়া বলিতেছি তোমার সামনের চিঠির জবাব আমি নিদেন ৪ পৃষ্ঠায় দিব।…
>
> তুমি লিখিয়াছ "শান্তিনিকেতনে বুঝি মেয়েরা পড়ে? তাহারা বুঝি খুব নির্মম ?"…
>
> হাঁ অনেক মেয়েরাই পড়ে বটে। আমার সঙ্গেও দুইটী ভদ্রমহিলা পড়েন। তাহাদের সঙ্গে মোটে একদিন কথা হইয়াছে—সেও নেহাৎ না পারিয়া। অবশ্য তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র বা উৎকন্ঠিত নহি। এতগুলি ছেলের সঙ্গে পরিচয় আছে যে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই দিনগুলি চলিয়া যায়।[৭৪]

ব্যাকরণগত ভুলত্রুটি নয়, আমরা শুধু ভাষার গতি ও লেখকের মানসপ্রবণতা অনুধাবনের চেষ্টা করছি। প্রচলিত সাধু-রীতি বর্জন করে পরবর্তী একটি চিঠিতে চলিত ভাষার কর্ষণ এবং লেখকের মানসিক দ্বন্দ্বও এতে সুস্পষ্ট। শান্তিনিকেতনের প্রভাবও স্পষ্টতর। পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ বাঙাল পরিবারে তখন 'চালিয়াতির' নামান্তর। যদ্দূর সম্ভব সেই 'চালিয়াতি' উচ্চাণরণই দ্বিতীয় পত্রে অনুসৃত। চলিত ভাষায় লেখক তখনো সড়গড় নন। অভ্যাস ও সংস্কারবশতঃ সাধুরীতি কোন কোন বাক্যে এসে গেছে। অবশ্য তা নিবারণের সবল প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। অনেক স্থানে লেখার টানে প্রথাগত কেতাবী ঢঙ্ এসে পড়ায়, লেখক তা কেটে অত্যাধুনিক চলিত রূপ ও উচ্চারণ ব্যবহার করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত তারিখবিহীন পত্রটি আনুমানিক ১৯২১-২২-এর লেখা হওয়া সম্ভব।—

> তোমার চিঠি গত পরশু পেয়েচি। কিন্তু তখখুনি উত্তর দিতে পারলুম না, কেননা তখন ডাক চলে যাব যাব কোরচে। কাল

ছুটি ছিল ভাবলুম কালই লিখব কিন্তু এমন সময় অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটার সময় সব্বাই মিলে বনভোজনে নিয়ে গেল।···

কি লিখি। ভিতরে যে কোনো কথা নেই তা বলছি নে। তবে কেন লিখতে পাচ্ছিনে? ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে।···

আমার আজকাল একটা ভয়ঙ্কর রোগ হয়েচে কেবল বসে বসে ভাবি তোমরা এখন কি কচ্ছ। আম্মা এতক্ষণে কাঁথা সেলাই শেষ করে নামাজ পড়া আরম্ভ করেচেন। মাইজম ভাই সাহেব চা তৈরী করবার জন্য তাড়া কচ্ছেন এবং খানু এখন পারিবে না বলিয়া বিষম আপত্তি কচ্ছে [প্রথমে 'করিতেছে' লিখে পরে 'কচ্ছে' করা হয়]। মাখন ও মলাই ইস্কুল হইতে ফিরে [প্রথমে "ফিরিয়া" লিখেছিলেন] চীৎকার করে [লেখার টানে "করিয়া" এসে গিয়েছিল, পরে করে] রুথদির কাণের দোলের [দুল্-earring] সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েচে। রমজান শুকনো কাপড়গুলি তুলচে।···

আশ্রমে আজকাল রোজই নতুন গান শেখানো হয়। রবিবাবু নূতন গান তৈরী করেন—দীনুবাবু (সেই মোটা ভদ্রলোকটী) সুর দেন এবং তারপর ছেলেরা শেখে। আমাকে রোজই তারা যেতে বোলে ['বলে']। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করেনা।[৯৫]

—আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিশোর মুজতবা এই পত্রে ক্রিয়াপদের সাধু-চলিতের দূষণ মুক্ত হতে পারেননি। 'রবিবাবু', 'দীনুবাবু'র উল্লেখে প্রবীণ-কিশোরের জ্যাঠামো প্রকটিত।—

মুজতবা আলীর প্রাপ্ত প্রথম মুদ্রিত রচনা দু'টো সাধু ভাষায় এবং তৃতীয়টি চলিত রীতিতে প্রণীত।

ক. 'যে-শব্দ আজকাল ভাষায় নেওয়া হইতেছে, সেগুলি কখনো কখনো শুদ্ধভাবে নেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ উপন্যাস-নাটক বা পপুলার পুস্তকে transliteration-অনুযায়ী লেখা হয় না। তাহার কারণ অধিকাংশ প্রেসে প্রয়োজনীয় রেখা ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকে না। দ্বিতীয় কারণ—অনেক উচ্চারণ যত কষ্ট করিয়া যত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় না কেন, সে-সব উচ্চারণ কোনো কালে সে-সব দেশের লোক করে নাই বলিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না—যে যে-রকম খুশী উচ্চারণ করে।'[৯৬]

খ. 'কবিতাতে নজরুল ইসলাম সাহেবের নাম করিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁহার সৃষ্টি পরবর্ত্তী যুগে কতদূর সম্মানিত হইবে। এ-যুগে তিনি আমাদিগকে অনেক কিছু দিয়াছেন, দশ বৎসর পূর্বে তিনি বাঙ্‌লা ভাষায় নূতন উদ্দীপনা আনয়ন করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্বের লেখা পড়িলে দেখা যায় যে, শব্দের ঝম্‌ঝমানিতে তিনিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—মরমী হিয়ার গুঞ্জনগান তিনি এখন আমাদিগকে মধুর ভাষায় শুনাইতে চাহেন। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু পাপ মনকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে জিজ্ঞাসা করে: নূতন কি পাইলে?'[৭৭]

গ. 'মিসরী মধ্যবিত্ত ও ধনীরা অনেককাল পূর্বেই তাদের দেশী বেশভূষা ছেড়েছে—একমাত্র তুর্কী-টুপী এখনও তার লাল-নিশান চড়িয়ে আছে। ধনী ও মধ্যবিত্তদের জীবনধারণ পদ্ধতি দশআনা বিলিতি। তারা হোটেলে খায়, বায়স্কোপ দেখে ও তিনটী বিলিতি ভাষায় কথা বলতে পারাকে ফ্যাশান মনে করে। তাদের গবর্ণমেন্ট-য়ুনিভার্সিটিতে হরেক রকম তালিম দেওয়া হয়।'[৭৮]

—লক্ষণীয় রচনা ক্রমশঃ বিশ্লেষণাত্মক, সাহিত্যধর্মী এবং মৌখিক ও বিদেশী শব্দের ফোড়নে দ্রুতিশীল। প্রথম উদ্ধৃতির আড়ষ্টতার সঙ্গে পরবর্তী উদ্ধৃতি দু'টোর তুলনায় ভাষার ক্রমবর্ধমান গতি সম্যক উপলব্ধ এবং প্রথম থেকেই গুরুচণ্ডালীর গণ্ডী অস্বীকৃত। ক্রমেই সরস রসিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি, আন্তরিকতা এবং সাহিত্য রসবোধে স্নাত মুজতবার রচনা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দু'টো রচনার অংশবিশেষে তারই স্বাক্ষর:

ক. 'বাংলা সাহিত্যের কোনও সেবা আমি এ যাবত করিতে সক্ষম হই নাই। তবুও কেন যে আপনারা আমাকেই [সভাপতিত্ব করিতে] আহ্বান করিলেন সুস্থ মনে তাহার বিচার করিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম যে আপনারা নিরপেক্ষ লোক চান—যে কেহ সাহিত্যের সেবা করেন তিনিই কোন না কোন দলে ভিড়িয়া যান এবং সাহিত্য সেবার কৌলিন্য যাহার নাই সে-ই শুধু নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। ...আমার মত সাহিত্য সেবা করেন নাই—ভুলেও কবিতা বা গল্প লেখেন নাই এমন ব্যক্তি বোধ হয় অদ্যকার সভায় কেহ নাই। আমার নির্গুণ যে গুণে পরিণত তাহা কে জানিত। আর সে হিসাবে যে আপনারা ঠিক লোকই খুঁজিয়া

বাহির করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে আমার চৌকস অজ্ঞতাই আমাকে নিরপেক্ষ রাখিবে।'[৯৬]

খ. 'ভক্তি ও সূফীতত্ত্ব দুই-ই প্রেমরসাত্মক। শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রীয় মুসলমান ধর্মে মিলন হইল না—সে মিলনের চেষ্টা রাজপুত্র দারা শিকূহ্‌র মত দুই একজন পণ্ডিত করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রেমের গঙ্গা-যমুনায় মিলন হইল। উত্তর ভারতবর্ষে কবীর, দাদূ ; মহারাষ্ট্রে সন্তোজী, মুহম্মদ উভয়ধর্মের শাস্ত্রের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া মধুর কণ্ঠে প্রেমের গান গাহিলেন। সে-গান মসজিদে মন্দিরে প্রবেশ করিল না কিন্তু ধর্মপিপাসার্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিল।'[১০০]

অতঃপর কলমী নামে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সৈয়দ মুজতবা আলীর আবির্ভাব 'সম্পাদকীয় পরবর্তী কলম' লিখিয়ে হিসেবে এবং এ'-পর্ব থেকে লেখনী-ই হয়েছে তাঁর জীবিকার্জনের বাহন। এ পর্বের প্রাথমিক অবস্থায় সাধুভাষার ঠাটকেই তিনি জিইয়ে রেখেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় সাংবাদিকের বিশ্লেষণী ক্ষুরধার যুক্তিধর্ম এবং পাঠক-লোভন বর্ণনভঙ্গী। সমাজচেতনা ও জাতিক-আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংবাদ-পত্রীয় নিবন্ধাবলীর মুখ্যবিষয়। এ-পর্যায়ে আমরা মুজতবা আলীর সংবাদপত্রীয় নিবন্ধের শৈলী নিয়ে আলোচনা করবো।

১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রচিত '১৯৪২-'৪৫'-এ স্বাধীনতাকামী শহীদ ও কারা-নিগৃহীতদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম :

> সেই স্বরাজ কি তাঁহারা পান নাই—যাঁহারা প্রাণ দিলেন যাঁহারা কারাগারে উৎপীড়িত হইলেন? জাগ্রত হইয়া মরিবার পূর্বে যে কয়দিন, যে কয় দণ্ড তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের মনে, তাঁহাদের সর্ব অস্তিত্বে, সর্বচৈতন্যে তো তখন স্বরাজ। তখন তাঁহারা পুলিশের এ আইন মানেন নাই, কানুন ভাঙ্গিয়াছেন, রাজাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, রাজপুরুষের হুঙ্কারের সম্মুখে অট্টহাস্য করিয়াছেন। তাঁহারা তো তখন দেহমনে মুক্ত পুরুষ। তাঁহারা তো চলিয়াছেন, চলার পথে—
>
> নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
> পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।।
> চরৈবেতি, চরৈবেতি।[১০১]

১৯৩৫-এ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বাধীনতা সংগ্রামী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুর্বিষহ কারাজীবনের বর্ণনা :

> ১৯৩৬ এর গ্রীষ্মে গ্রেপ্তার ও সাত মাসের জেল। ৩৭-৩৮ বাহিরে। সেপ্টেম্বর ৩৯-৪০ জেলে—প্রায় এক বছর। ৪১-৪২ এক বৎসর বাহিরে। ৪২ এর এপ্রিল পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার ও বন্দী —তারপর ফতেপুর, তারপর—বাঙলা দেশের জেল—সর্বকারাগারতীর্থ পরিক্রমা করিয়া এখন তিনি তথাগত—আজও তিনি জেলে। একটানা তিন বৎসর আটমাস। কত রোগ শয্যা মৃত্যুদর্শন কত হাসপাতাল, আত্মীয় স্বজনের কত আকুলি বিকুলি কত কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত প্রতিশ্রুতি কত আশা---নৈরাশ্যের সুখস্পর্শ পদাঘাত।[১০২]

সাধুভাষার কাঠামোতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ এবং সর্বোপরি দুর্বল-নিপীড়িতের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম স্নেহধারা লেখাগুলোকে জনপ্রিয় করেছিলো এবং এ' জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর অনন্য বর্ণনভঙ্গী। সংবাদ-পত্রের সাধারণ পাঠক সংবাদের সঙ্গে রসাস্বাদনেরও পক্ষপাতী। মুজতবার রচনায় সেই রসের অণুমাত্র ঘাটতি নেই। যুদ্ধ-অপরাধী জার্মানের 'বিচার' প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'হেস্, গ্যোরিঙ, শাখ্ট্, রিবেনট্রপ···ইত্যাদিকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া নুরেনবের্গের পূজামণ্ডপে, এই নবমীর হিড়িকেই লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কামারের আপশোষের অন্ত নাই যে, তিনটা জব্বর পুরুষ্টু পাঁঠা বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, হিটলার, গ্যোবেলস্ ও হিমলার।'[১০৩]

অন্যত্র :

'জর্মণী যে শুধু হারিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তাহাকে চিরতরে পঙ্গু করিবার জন্য তাহার সমস্ত কলকব্জা জিগর-কলিজা টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে ও হইতেছে।'[১০৪]

দীর্ঘস্থান জুড়ে আছে 'মধ্যপ্রাচ্য' প্রসঙ্গ :

ক. '১৯৪৫-৪৬-এ অবস্থা ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফরাসী সম্পূর্ণ ঘায়েল। সে জখমী কুকুরের ন্যায় দেশের ক্ষতস্থল লেহন করিতেছে, মধ্যপ্রাচ্যের শিকার তাড়না করিবার মত উৎসাহ ও শক্তি তাহার আদপেই নাই।'[১০৫]

ফলস্তিনীদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং দম্ভের প্রতিরূপ বহিরাগত ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার স্ফুরণ:

খ. 'শূন্যোদর আরব ভিখারী রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিবে চতুর্দিকে আলোকমালায় সুসজ্জিত কাফে, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, থিয়েটার। সহস্র সহস্র ইহুদি যুবক-যুবতী উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া উজ্জ্বল স্বতশ্চলশকটে আরোহণ করিয়া প্রমোদাগার হইতে প্রমোদাগারে পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পকেটে অর্থ, চেহারায় দম্ভ। মদ্য চলিয়াছে, নৃত্য চলিয়াছে; 'গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো পথ দিয়া চিরন্তন দীপান্বিতার সন্ধানে'···চলিয়াছে ভাগ্যবান ইহুদি যুবক-যুবতী।'[১০৬]

গ. 'এই সব দীন দরিদ্র জনকে [ফলস্তিনীদের] বন্য পশুরই ন্যায় গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিদেশীর জন্য স্থান করিতে হইবে যাহাতে বিদেশী চর্বচূষ্য ভোগ করিতে পারে, হোটেল নির্মাণ করিয়া নাচিতে কুঁদিতে পারে, উত্তম পালঙ্ক শয্যায় যদুবংশ বৃদ্ধি করিতে পারে।'[১০৭]

জাতিসংঘ ভবনের চক্ষুপীড়ক দম্ভের প্রকাশও লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত:

> বাঙাল যেমন তাজ্জব হইয়া হইকোর্ট দেখে, এককালে বিদেশীমাত্রই জিনীভা শহরে উপস্থিত হইয়া লীগ অব নেশনসের এমারত তাজ্জব হইয়া দেখিত।···
>
> তবু না হয় দালান-কোঠার বাহার, আকার মানিয়া লইতাম, কিন্তু যে সাকার দম্ভ সে এমারতের সর্বত্র বিরাজমান ছিল তাহার মূর্খতা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাইক, বরকন্দাজ, ঝাড়ু সরদার, কাণমলাদার নকীব, নফরে এমারত ছয়লাপ। প্রতি দরজার গোড়ায়, প্রতি লিফ্‌টের কোণায় দেবদূতের বেশে যমদূতেরা দর্শককে চোখ দিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার করিয়া মাপে, সাতবার করিয়া 'পাস' দেখিতে চায়, হরেক রকম অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।[১০৮]

এ-সমস্ত নিবন্ধের স্টাইলে আলী সাহেব ক্রমশঃই স্বব্যক্তিত্বে প্রকাশমান। প্রথম পর্যায়ে 'সত্যপীর' নামে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'হযবরল' কলাম ও অন্যান্য লেখায় তিনি সাধুভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে 'রায় পিথৌরা' নামে 'দেহলি-প্রান্তে' ও

'সপ্তপর্ণী' কলামে এবং দৈনিক বসুমতীতে লিখিত নিবন্ধসমূহে মুজতবা সম্পূর্ণরূপে চলিত রীতিকেই অবলম্বন করেন। অবশ্য 'দেহলি প্রান্তে'র প্রথম কয়েকটি লেখায় 'সাধুপন্থার' শরণ নিয়েছিলেন। এ-সমস্ত রচনায় ধার ও মুখরোচকতা সমান মেকদারে ব্যবহৃত। এগুলোই দৈনিক পত্রিকার গণপ্রিয় আদর্শ নিবন্ধ। দৈনন্দিন একঘেঁয়েমির মধ্যে নিরস তথ্যও সরসরূপে পাঠকের চিত্তভূমি রসার্দ্র করে তোলে। যুদ্ধোত্তরকালের লেখাগুলোতে রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সাধারণ জনের আগ্রহও তখন এদিকেই। নিদর্শন :

ক. 'রুশ বর্গী আসছে। বুলবুলিতে যখন সব ধান খেয়ে ফেলেনি তখন সে ধান পাঠাও···জার্মানীতে। সেখানে জার্মান মুর্গী পোষো। তারপর রুশ দর্গায় জবাই করো, ফাঁড়াগর্দিশ যখন উপস্থিত হবে।'[১০৯]

খ. 'তারপর গণতান্ত্রিক অস্ট্রিয়া একদিন ডিক্‌টেটর হিটলারের পেটে গেল—ইংরেজ গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলল না। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার মত গণতান্ত্রিক দেশের দু'খানা আস্ত ঠ্যাং ইংরেজ স্বহস্তে কেটে হিটলারকে ভেট দিলে—গতিক বুঝে হিটলারও কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি দেশটাকেও কপাৎ করে গিলে ফেললে।···

রাগ হল ইংরেজের যেদিন সে শুনতে পেল জর্মনি হঠাৎ সব্বাইকার পরম দুষমন রুশের সঙ্গে দুম করে মিতালি করে বসে আছে। হায়, হায় এতদিন ধরে যে কুত্তাটাকে দুনিয়ার মাংশ খাওয়ালুম চোট্টাকে কামড়াবার জন্য সেই কুত্তাটাই চোট্টার সঙ্গে মিলে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে আমার দিকে তাকিয়ে। ইয়া আল্লা, এ কী নেমকহারামী, এ কি বে-তমীজ বে-ইমানী।'[১১০]

গ. 'এককালে এদেশে বিস্তর ফার্সী চর্চা হত। সরকার, মুন্সী, বখ্‌শী, কানুনগো, এসব যাঁদের পদবী তাঁদের বাপ-পিতামো উমদাসে উমদা ফার্সী শিখে এককালে মোগল রাজত্ব চালিয়েছেন। সরকার তো চীফ-সেক্রেটারী, বখশী মানে চীফ পে মাস্টার অর্থাৎ একাউন্টেন্ট জেনারেল! বাপ্‌স্—এসব আপিসারদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানে তো বাঘের সামনে দাঁড়ানো। কান দিয়ে ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। আর ওনরা রেগে গেলে তো হাড়্ডি বিলকুল পিলপিলিয়ে যায়।'[১১১]

ঘ. 'দেহলি প্রান্তে বিশ্বেশ্বর বলুন, কাবা বলুন, এখানকার চক্রবর্তী কনট···সার্কল। সুসজ্জিত বিপণিমণ্ডলী চক্রাকারে এক সুরম্য উদ্যানকে

পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপূর্বদর্শন কামিনীগণ সুরম্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই আপন-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। কোনো ললনা পাদুকা ক্রয় করিতে উপবেশন করিয়াছেন—রাতুল নখাগ্র··· সম্প্রসারিত করিয়া মধুর কণ্ঠে কাম্য পাদুকার নখ-শির বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখের পাদুকা-স্তূপ হিমাচলকে অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে, সেই গগনচুম্বী স্তূপের পশ্চাতে আপণ-স্বামী কিম্বা আপন স্বামী কাহাকেও আর দেখা যাইতেছে না। তাহা কি মধুর দৃশ্য!'[১১২]

চটুল কৌতুকপূর্ণ উপস্থাপনার সমান্তরাল ভাবগম্ভীর বর্ণনাতেও মুজতবা সমান দক্ষ।---

> প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়লো মা গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এপার ওপার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে। সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কি সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজতযবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য! কিন্তু এ আমি সইব কি করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষণ,. . .তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ করো, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে,—[১১৩]

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' মূলতঃ লঘু নিবন্ধের কলাম। এই কলামেও কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদপত্রীয় নিবন্ধ প্রকাশিত। ভাষাও অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রগামী। 'যাবনিক' শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও গ্রাম্য শব্দের সংমিশ্রণে লেখা স্বাদুতর, হাস্যরসিকতায় টৈটম্বুর। এবং পরিবেশিত বস্তুও প্রত্যাশিত রসঘন। স্বাভাবিক কারণেই 'কলামটি' পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিলো।।—

ক. [চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট]' 'হাশা দর্শন কামনা না করলে হিটলারই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। এবং সে হুকুম তামিল না করার মত তাগত তাঁর ছিল না। মহামান্য ইংলনডেশ্বরের অতিসামান্য প্রধানমন্ত্রী চেমবারলেন মাত্র ছ'মাস পূর্বে বার চারেক ওড়াওড়ি করেছেন

লনডন ম্যুনিকের আকাশমার্গে—হিটলার তাঁর থানা থেকে নড়েননি একটি বারও। আর আজ বুঝি তাঁতী হালা ফারসী পড়বে!'[১১৪]

খ. 'যখন দেশবাসী দেখে, থেদোমেদো পর্যন্ত নির্ভয়ে মদ্য নিবারণ আইনকে হরহামেশা, হট্টবিলাসিনীগণসহ, মুক্তহট্টে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছে তখন সরকারের অন্যান্য চিরাচরিত ন্যায়ধর্মসম্মত আইন-কানুনের প্রতিও জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি, কমতে থাকে। সেই যে এক মহাশয়া একাদশী থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুসলমান হয়ে পেয়ে গেলেন ত্রিশ দিনের রোজা!'[১১৫]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'দেশ'-এর 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' ও 'উভয় বাংলা' এবং ঢাকা থেকে প্রচারিত 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' সিরিজও সংবাদপত্রীয় নিবন্ধ-মালা। এবং এগুলোই মুজতবা আলীর শেষ জীবনের রচনা। এ সমস্ত লেখায় কখনো কখনো লেখকের উত্তেজনা ও ক্রোধ সংযম অতিক্রম করেছে।—

ক. 'সাঁতারের কথা বলছিলুম। হারামীরা [পাকিস্তানী সেনা] স্পষ্ট চোখে দেখতে পেল, বাঙালী সমূচা বন্দুক হাতে নিয়ে গপাগপ ডুব সাঁতার দিয়ে বুড়ী গঙ্গার জল পেরুল, তথাপি বাবুদের কানে জল গেল না। কে জানে, কে বোধ হয় হুকুম দিয়েছিল—ব্যবস্থা করা হল, জোয়ানরা সাঁতার কাটা শেখবেন! আরে মশয়, কাঁচায় না ন্যুইলে বাঁশ—! তদুপরি আরেক গেরো। যে-আপিসর হুজুররা ডেঙ্গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম কপ্‌চাচ্ছেন তেনারাই যে জলে নাবলে পাথর বাটি। বাঁজী ছুঁড়ি পয়লা পোয়াতীকে শেখাচ্ছে বাচ্চা বিয়োবার কৌশল।'[১১৬]

লেখকের আত্মাভিমান প্রকাশের নিরাভরণ ভাষা :

খ. 'এ বঙ্গদেশ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিরকাল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আরাকান, দক্ষিণে সমুদ্র। অথচ পশ্চিম থেকে যুগ যুগ ধরে শক হূন তুর্ক পাঠান মোগল ভারতের পশ্চিম প্রান্তে হানা দিয়েছে দলে দলে। তাদের চাপ পড়েছে পাঞ্জাবের উপর সে-দেশের লোক চাপ দিয়েছে উত্তর প্রদেশের উপর—করে করে সর্বশেষ চাপ পড়েছে বাঙলার উপর। সে হতভাগা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ কোনোদিকেই চাপ দিতে পারে না, পালাবার পথ পর্যন্ত তার নেই। সে তখন রুখে

দাঁড়াবে না তো কি করবে? সেটা বিদ্রোহ নয়,—এমন কি সেটাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিলেও মোক্ষমতম তত্ত্বটি প্রকাশ পায় না। প্রতিবারেই তার রুখে দাঁড়ানোটা নিতান্তই, একান্তভাবেই আপন জীবন রক্ষার্থে—ওসমানের [বাংলার শেষ পাঠান নরপতি] সেই কোণঠাসা ছোট্ট চিড়িয়াটিকে ধরতে গেলে সেও ঠোকর মারত। এ প্রচেষ্টাকে 'স্বাধীনদা সংগ্রাম' 'মুক্তিযুদ্ধ' 'দেশাত্মবোধজাত আত্মাহুতি,' ইত্যাদি গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী সদৃশ উচ্চনামে ডাকুন আর নাই ডাকুন, ওটাকে কাশ্মীর কান্যকুব্জ পাঠান মোগল রাজন্যবর্গের মুখপাত্র হয়ে 'বিদ্রোহ' নাম দিয়ে স্পর্শকাতর জনকে বিড়ম্বিত করবেন না।"[১১৭]

গ. "···মূল বক্তব্যে কিছুতেই নিজেকে সীমবদ্ধ···রাখতে পারিনে। ···নাক বরাবর মোকামের দিকে—না এগিয়ে মোকা বেমোকায় আকছারই পথের দু'পাশে নেমে ফুল কুড়োই, প্রজাপতি স্পন্দন ভ্রমর গুঞ্জনে বারবার মুগ্ধ হয়ে দেখি, তৎতদিনের শেষে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—এবং মন্‌জিলে মার দূর আস্ত্‌। পথের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ি।···সেই কুড়োনো ফুলের দু'চারটে পাঠকের সামনে অবরে সবরে পেশ না করতে পারলে আমার মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।'[১১৮]

ঘ. 'সচরাচর কাবুলে এগানা-বেগানা কেউ এলেই উচ্চকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানানো হয়, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—ব-ফরমাইদ, তশরীফ আনয়ন করুন—তশরীফ বিয়ারিদ, আপনার কদম মবারক হোক—তশরীফ বিয়ারিদ, আপনার কদম মবারক হোক—কদম তান মবারক, আপনার চশ্‌ম রৌশন হোক —চশ্‌মে তান্‌ রওশন।" সম্পূর্ণ পাঠটি বেহদ দরাজ পত্রিকায় গুন্‌জাইশ নেহায়েত তঙ্গ। আমি মজবুর হয়ে মখতসরে কাবুলের সিভিল প্রটোকলটি সেরে নিলুম।'[১১৯]

শেষোক্ত উদ্ধৃতি দু'টোতে ফার্সী-উর্দু-ইংরেজী শব্দের সঙ্গে 'খাট্টা' [হিন্দী] কিংবা 'এগানা-বেগানা'-র মতো একান্তই ঘরোয়া শব্দ নির্বিরোধে সহাবস্থান করছে। এ-ধরনের শব্দের এককালীন জাত-গোত্র যাই হোক না কেন, রূপ পাল্টে বর্তমানে এগুলো বাঙালী জীবনের সঙ্গে একীভূত। সুতরাং লেখ্য-ভাষায় এদের আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং এ-কাজে বিবেকানন্দ-হরপ্রসাদ-প্রমথ-কেদার বন্দ্যো-রাজশেখর-মুজতবাদের মতো দরাজ দিলের গুণীর পক্ষেই অগ্রণী ভূমিকা পালন ও সার্থকতা অর্জন সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১ বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৯

২ সুজিতকুমার সেনগুপ্ত : উপন্যাস ব্যাতিরিক্ত ধারাবাহিক গদ্যকর্ম, দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৪০-১৩৯০, পৃ. ৩৩১

৩ পুস্তক পরিচয় [শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'নিরীক্ষা'] : দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, পৃ. ৫২৪

৪ শিবরাম চক্রবর্তী: শব্দযোগ, শিব্রাম রচনাবলী (সাক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৮৩), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫২—৫৩

৫ *The Problem of Style* (Oxford Paper backs1960) পৃ. ১২২

৬ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, (১ম প্রকাশ), পৃ, ২

৭ পবিত্র সরকার ; বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন ; বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা (ডক্টর অরুণকুমার বসুর মুখ্য সম্পাদনায় ১ম প্রকাশ), পৃ. ৬১

৮ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস (১ম প্রকাশ), পৃ. ২১

৯ ঐ, পৃ. ২২৪

১০ মুনীর চৌধুরী : বাঙ্লা গদ্যরীতি (২য় মুদ্রণ), পৃ, ৪

১১ সৈয়দ আলী আহসান: গদ্য ও কবিতা, সমতট (প্রকাশন ১৩, Vol. 4. No. 1), পৃ. ২২৮

১২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা গদ্যের খাত-বদল, সাহিত্য ও সাহিত্যিক (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৩

১৩ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত : বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক (১ম প্রকাশ), পরিশিষ্টে উদ্ধৃত।

১৪ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৩৯

১৫ Sisir Kumar Das : *Early Bengali Prose* (1966), পৃ. ৮৩

১৬ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা গদ্যের খাত-বদল, সাহিত্য ও সাহিত্যিক (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৮

১৭ বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি, হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত), পৃ. ২৫০

১৮ প্যারীচাঁদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল (বাণী প্রকাশ,১৩৮৯), পৃ. ৬৫

১৯ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (বিশ্ববাণী প্রকাশন, ১৯৮৩), পৃ. ১০৪-০৫

২০ প্রমথ চৌধুরী, কথার কথা, বীরবলের হালখাতা (১৩৩৩), পৃ. ১২

২১ রাজশেখর বসু, গ্রহণীয় শব্দ, দেশ, ৩ মে, ১৯৫৮, পৃ. ১১

২২ হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা (শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), পৃ. ৩৩-৩৪

২৩ ঐ, পৃ. ৫-৬

২৪ ঐ, পৃ. ৪৮

২৫ ঐ, পৃ. ১২২

২৬ ঐ, পৃ. ১৯৫

২৭ গোপাল হালদার, ভূমিকা, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, (২য় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ), পৃ. সাতাশ

২৮ আবার অতি অল্প হইল, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ (৩য় সংস্করণ) পৃ. ৫১৭-১৯

২৯ ব্রজবিলাস, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড (সাক্ষরতা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ), পৃ. ৪৬৪

৩০ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (বিশ্ববাণী প্রকাশন), ১৯৮৩), পৃ. ২০৯

৩১ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ৩৪৬

৩২ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা এপ্রিল, ১৯৪৫, পৃ. ৪

৩৩ বাঙ্গালা ভাষা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রবন্ধ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ) পৃ. ৪৮৪

৩৪ মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধু, (কোহিনুর লাইব্রেরী প্রকাশিত, ১৭শ মুদ্রণ, ১৩৬২), পৃ. ৫৫৯-৬০

৩৫ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯৭৭), পৃ. ৩৩২

৩৬ ঐ, পৃ. ৩৩৯ (?)

৩৭ ঐ, পৃ. ৪০

৩৮ ঐ, পৃ. ৩৪৯

৩৯ মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক ১৩৩৬, পৃ. ২৯-৩০

৪০ সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, পৃ. ৬২২-২৩

৪১ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী : কথার কথা, বীরবলের হালখাতা (১ম পর্ব্ব, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৭

৪২ বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা (ডক্টর অরুণকুমার বসুর মুখ্য সম্পাদনায়, ১ম প্রকাশ) পৃ. ২৭২

৪৩ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন (১৩৯০), পৃ. ৪৪-৪৬

৪৪ হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত) পৃ. ২৫৫

৪৫ ডমরু-চরিত (১ম সংস্করণ), পৃ. ৪৭
৪৬ ফোকলা দিগম্বর (১ম সংস্করণ), পৃ. ৭২
৪৭ ময়না কোথায়! (১৩১১), পৃ. ৮২
৪৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯), পৃ. ৩৫
৪৯ ভাববার কথা, ঐ, পৃ. ৪৪
৫০ পরশুরাম : বিরিঞ্চিবাবা, কজ্জলী (১ম প্রকাশ), পৃ. ২৩-২৪
৫১ অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, পৃ. ২০৬-০৭
৫২ শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য : হৈরা, সবুজপত্র, ফাল্গুন ১৩২৪, পৃ. ৬৪৩
৫৩ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (বিশ্বভারতী, ১৯৬১), পৃ. ৬১
৫৪ ঐ, পৃ. ১৯০
৫৫ জীবন-স্মৃতি (১ম সংস্করণ), পৃ. ২১
৫৬ বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫-৯৬
৫৭ ঐ, পৃ. ৩৯৯
৫৮ ঐ, পৃ. ৩৯৬
৫৯ বুদ্ধদেব বসু ; রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৭-৭৮
৬০ সৈয়দ আলী আহসান, ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ।/
৬১ পাঠকের নিবেদন, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫
৬২ ঐ, পৃ. ৪৪৫-৪৬
৬৩ গ্রন্থ পরিচয় (চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী), বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৯, পৃ. ১৭০
৬৪ এক নম্বর বর্মন স্ট্রীট, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১, পৃ. ১০৮
৬৫ ৺প্রমথ চৌধুরী—৺সবুজপত্র, পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ. ২৪৪
৬৬ প্রমথ চৌধুরী—ভাষা ও শৈলী, পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ২৩ নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৩৯০
৬৭ রহস্য লহরী, কত না অশ্রুজল, পৃ. ২১৩
৬৮ সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাগ, শরৎ-কালীন সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২১
৬৯ অরুণকুমার বসু, ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ।৵

৭০ গ্রন্থপরিচয় (দেশে বিদেশে), বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬, পৃ. ১৪০

৭১ পুস্তক পরিচয় (শব্‌নম্‌), বেতার জগৎ, ২২ নভেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৮৬৪ ক

৭২ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোচনা (শহ্‌র্‌-ইয়ার), দেশ, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৬, পৃ. ২৮৫

৭৩ রশীদ করীম : ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলী, দৈনিক বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

৭৪ সাক্ষাৎকার-২৮

৭৫ মুসাফির (১ম প্রকাশ), পৃ. ১৪৫-৪৬

৭৬ শহ্‌র্‌-ইয়ার (১ম সংস্করণ), পৃ. ১৮

৭৭ মুসাফির (১ম প্রকাশ), পৃ. ১৪২

৭৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ./০

৭৯ এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ১৫২

৮০ সত্যপীর : সাধু না চলিত, দৈনিক আনন্দবাজার, ১ মার্চ, ১৯৫৯, পৃ. ৪

৮১ সৈয়দ মুজতবা আলী : অভিধান পাঠ, পঞ্চতন্ত্র, দেশ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫১, পৃ. ১৬০

৮২ ঐ, কাব্যলোক, কৃত্তিবাস, বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৫৪

৮৩ পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৬

৮৪ জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৮৩

৮৫ শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র

৮৬ ৺অমলেন্দু সেনকে লেখা পত্র

৮৭ শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৮৮ কাব্যলোক, কৃত্তিবাস, বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা ১৩৮০, পৃ. ৫৩

৮৯ 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'; পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ৬২

৯০ সত্যপীর : সাধু, না চলিত ; দৈঃ আনন্দবাজার, ১ মার্চ, ১৯৫৯, পৃ. ৪

৯১ শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৯২ শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে লিখিত পত্র

৯৩ চোখের জলের লেখক, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ৮৮

৯৪ এডভোকেট সয়ফুল আলম খানকে লেখা পত্র

৯৫ এডভোকেট সয়ফুল আলম খানকে লেখা পত্র

৯৬ বাঙ্‌লা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৩৯

৯৭ বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪১, পৃ. ৪০৩

৯৮ মিসরের বিদ্যায়তন, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ. ৮৩

৯৯ সভাপতির অভিভাষণ, মাসিক আল্‌-ইসলাহ্‌, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ. ২৫১

১০০ মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের, চতুরঙ্গ, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ৪০৭

১০১ '৪২—'৪৫, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৬

১০২ হযবরল (৬), ঐ, পৃ. ৬৫

১০৩ সত্যপীর : বিচার, দৈনিক আনন্দবাজার, ২৬ অক্‌টোবর, ১৯৪৫, পৃ. ৪

১০৪ সত্যপীর : রুশনীতি, ঐ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ৪

১০৫ মধ্যপ্রাচ্য, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৩৮

১০৬ সত্যপীর : প্যালেস্টাইন, দৈনিক আনন্দবাজার, ৫ এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪

১০৭ সত্যপীর : দ্বিজ-দাসত্ব, দৈনিক আনন্দবাজার, ১০ মে ১৯৪৬, পৃ. ৪

১০৮ সত্যপীর : হযবরল, দৈনিক আনন্দবাজার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪

১০৯ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৫৩

১১০ রায় পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, দৈনিক আনন্দবাজার, ৩ জুন ১৯৫২, পৃ. ৪

১১১ রায় পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪

১১২ রায় পিথৌরার কলমে (১২), ঐ, পৃ. ২৫১

১১৩ রায় পিথৌরা, সপ্তপর্ণী, দৈনিক আনন্দবাজার, ৭ এপ্রিল, ১৯৫৩, পৃ. ৪

১১৪ হাশা-নাশা গুত্তা, পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ২ নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৭৬

১১৫ ভিজে-শুক্‌নো-স্যাঁৎসেঁতে, পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ৩০ নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৪৭২

১১৬ বাংলাদেশ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮

১১৭ উভয় বাঙলা, ঐ, পৃ. ৪০৮

১১৮ পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় (১ম প্রকাশ), পৃ. ২০

১১৯ ঐ, পৃ. ৫৮